বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য : ১৯২০ - ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ

রঘুনাথ ভট্টাচার্য

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত গবেষণাপত্র

M.Phil.

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯৮

RB
B
891.444
BHB

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য : ১৯২০-১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য

Dhaka University Library
382690

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত গবেষণাপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382690

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্যে প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ "বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ঃ ১৯২০-১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ" আমার পাঁচ বছরের অধিককালের পরিশ্রমের ফল।

১৯৯৩ সনের পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সাঈদ-উর রহমানের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করি। গবেষণার প্রয়োজনে ১৯৯৭ সনে আমাকে তিনি কলকাতা যেতে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর উদযোগে মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাপ্ত আর্থিক অনুদানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কলকাতা গিয়ে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। এজন্য আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলা বিভাগে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদ্বয় অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক- এর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমি গবেষণার ব্যাপারে আলাপ করে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হয়েছি। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

382690

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শ্রী রতন কুমার দাশ ও জনাব মোঃ আমান উল্লাহ এবং বাংলা বিভাগের প্রফেসর আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত সাইদা খানম, বাংলা একাডেমীর সহকারী পরিচালক জনাব আমীরুল মোমেনীন সহ অন্যান্য ব্যক্তি আমাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছেন। তাছাড়া ধামরাই নবযুগ ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আলতামাসুল ইসলাম কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অনুমতি প্রদানের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান পরামর্শ ও

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করে আমার গবেষণা কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট গবেষক ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি গবেষণার অনেক মূল্যবান বই ব্যবহার ও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি।

বন্ধুবর শ্রী বাসুদেব রায় গবেষণার কাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। গবেষণাপত্র কম্পিউটার কম্পোজের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
এপ্রিল, ১৯৯৮।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য

২২৬৯০

Dhaka University Institutional Repository

ঃঃ সূচীপত্র ঃঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৪
প্রথম অধ্যায় ঃ রাজনীতি	৫-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ধর্ম	২৯-৫১
তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাহিত্য	৫২-৬৬
চতুর্থ অধ্যায় ঃ সমাজ	৬৭-৯১
পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিবিধ	৯২-১০৭
উপসংহার ঃ	১০৮-১১৮
পরিশিষ্ট ঃ	
ক) আলোচিত গ্রন্থ	১১৯-১২২
খ) সহায়ক গ্রন্থ	১২৩-১২৯
গ) প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ	১৩০-১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সাহিত্য জাতি ও সমাজের দর্পণ স্বরূপ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালী সমাজ তথা জাতির জীবন কাব্যে বিম্বিত হয়েছে; আধুনিকযুগে তা প্রগাঢ়ভাবে বিধৃত হয়েছে গদ্যে। অপরদিকে বাঙালী জাতির মনন ও ভাবসংঘাতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন প্রবন্ধেই বেশি করে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যের অপরাপর শাখার তুলনায় প্রবন্ধ-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও অপরিপুষ্ট হলেও প্রবন্ধকারদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একটি গৌরবময় আসন অধিকার করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত। সে সময়ে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই প্রবন্ধের সূত্রপাত ঘটে। রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) সামাজিক আন্দোলন থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত বাঙালীর কর্ম ও চিন্তার ধারা যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, তার ভেতর দিয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করার সুযোগ পায়। স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৯১১) সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা স্বদেশপ্রেমমূলক রচনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

রামমোহন রায় এবং তাঁর সমসাময়িক অনেক মনস্বী লেখক 'প্রবন্ধ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রস্তাব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়ে 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করে। পরবর্তীসময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) বহুল প্রয়োগে 'প্রবন্ধ' শব্দটি বর্তমান কালের বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ হিসেবে চিহ্নিত হয়।[১]

---

[১] ডঃ অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (কলকাতা ঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা ৬।

Dhaka University Institutional Repository

রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজ-সংস্কার মূলক কিংবা আধ্যাত্মিক বিষয় প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন ছিল; পরবর্তীসময়ে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ডঃ অধীর দে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেনঃ রামমোহন পর্ব, অক্ষয়-ঈশ্বর পর্ব, বঙ্কিম পর্ব, রবীন্দ্র পর্ব ও রবীন্দ্রোত্তর পর্ব।[২]

১৯২০-১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকগণ হলেনঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), চারুচন্দ্র রায় (১৮৭০-১৯৪৫), ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী(১৮৭৩-১৯৬০), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত (১৮৮২-১৯৭৯), নলিনী-কিশোর গুহ (১৮৮৬-১৯৭৭), আবুল হুসেন (১৮৮৬-১৯৩৮), নলিনীকান্ত গুপ্ত (জন্ম ১৮৮৯), মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), অন্নদাশঙ্কর রায় (জন্ম ১৯০৪-) প্রমুখ।

দুই

আলোচ্য দশকটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ইংরেজ শাসনে থাকায় ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মভাব বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয় দশকে দেশ এবং বিদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ (১৯১৩), সবুজপত্র পত্রিকার আত্মপ্রকাশ (১৯১৪), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), রুশ বিপ্লব (১৯১৭) ইত্যাদি ঘটনার

---

[২] ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব তৃতীয় দশকের সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় দশকের ভাব-সংঘাতের প্রতিফলন তৃতীয় দশকে এসে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধের শাখাকে আলোকিত করে।

গুরুত্বপূর্ণ এই দশকটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা আলোচিত হয়নি। এ দশকে ভারতবর্ষের জনগণ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১), খিলাফৎ আন্দোলন (১৯১৯-২৪), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২০) ইত্যাদি ঘটনার প্রভাব বাঙালীর চিন্তা জগতে পরিবর্তন এনে দেয়। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতির মৌলিক মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটায় সাধারণ জন সমাজের মধ্যে ভাব-সংঘাত তীব্রতর হয়। সেই দশকে সমাজ জীবনে সাম্প্রদায়িক চেতনাও মাথা চাড়া দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয় অনেক পত্র-পত্রিকা। গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হলো 'ধূমকেতু' (১৯২২), 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালি কলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'শিখা' (১৯২৭)।

'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) বাঙালী মুসলমানকে অন্ধ ধর্মানুরক্তি ও কুসংস্কারের হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদে 'শিখা' পত্রিকা প্রকাশ করে। বাঙালী মুসলিম সমাজের এই নতুন যাত্রা তৃতীয় দশক থেকেই শুরু হয়। যুগান্তরের আভাষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়ও রয়েছে। 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থে (১৯১৬) 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় কবি লিখেছেন ঃ

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ —
'বন্দরের কাল হল শেষ।' [৩]

---

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলাকা ঃ ঝড়ের খেয়া (কলকাতা ঃ বিশ্ব ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৫), পৃষ্ঠা ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নমুখী চিন্তা চেতনায় মুখর তৃতীয় দশকের প্রবন্ধ সাহিত্যকে গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনালোচিত বিবেচনা করে গবেষণার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। সেই দশকে প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বাঙালীর চিন্তা-জগতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। প্রবন্ধে আঙ্গিক কিংবা লেখকের রচনাশৈলী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করার চাইতে চিন্তাচেতনার ধারা নির্দেশ করতেই মনোনিবেশ করা হয়েছে।

তিন

অভিসন্দর্ভে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা করা হয়েছে। এতে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন ও সাম্রাজ্য বিস্তার, ভারতবাসীর উপর অত্যাচার, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ। এ অধ্যায়ে কর্মযোগ, জন্মান্তরবাদ, অবতারতত্ত্ব, জ্ঞান ও যজ্ঞ, শক্তিসাধনা-সাম্য ও স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পুস্তকগুলি বিবেচনা করা হয়েছে।

সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির কৌশল, সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই পর্বের লেখকরা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ। যৌবনধর্ম, মুসলমান সমাজের অতীতমুখিতা, নারী স্বাধীনতা, পাশ্চাত্য প্রভাব ও পরনির্ভরতা, মানবিক মূল্যবোধ, বাংলার কৃষক সমাজ ইত্যাদি প্রসঙ্গ রয়েছে সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধে।

'বিবিধ' শিরোনামের পঞ্চম অধ্যায় সাজানো হয়েছে - প্রেম, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত প্রবন্ধ পুস্তকের আলোকে।

গবেষণাপত্রের শেষ পর্যায়ে রয়েছে উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর থেকে বিশ্বব্যাপী বিরাট পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। রাশিয়ায় জার সাম্রাজ্যের পতন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় ১৯১৭ সালে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। সবগুলির প্রভাব পড়ে ভারতবর্ষে। তার ফলে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ঘটনাবহুল হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। শ্রমিক ও কৃষকেরাও আন্দোলনমুখী হয়। তার প্রভাব সাহিত্যেও পড়ে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য দশকে রাজনীতি বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ফিরিঙ্গি-বণিক্, (১৯২২)

*২. অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, বিদ্রোহী রুশিয়া (১৯৩০)

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, যুগবাণী (১৯২২); রুদ্র মঙ্গল (১৯২৬);
দুর্দিনের যাত্রী (আনুমানিক ১৯২৬)

৪. কাজী আবদুল ওদুদ, নবপর্যায়, দ্বিতীয় খন্ড (১৩৩৬)

৫. চারুচন্দ্র রায়, কমলাকান্তের পত্র (১৩৩০)

*৬. দেব জ্যোতি বর্মণ, কার্ল মার্কস (১৯৩০)

৭. নলিনীকিশোর গুহ, * বাংলায় বিপ্লববাদ (১৩৩০);
* ভারতের দাবী (১৩৩২); পথ ও পাথেয় (১৯২৮)

*৮. নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রুশ জাতির কর্মবীর (১৯২৪)

৯. প্রমথ চৌধুরী, দু-ইয়ারকি (১৯২০)

১০. প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জাতি গঠনে বাধা-ভিতরের ও বাহিরের (১৯২১)

*১১. প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি, লেনিন ও সোভিয়েট (১৯২২)

*১২. প্রিয়কুমার গোস্বামী, স্বাধীনতার স্বরাজ (১৯২৬)

*১৩. ফণিভূষণ ঘোষ, লেনিন (১৯২১)

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বলাই দেবশর্ম্মা, বৈশাখী-বাঙলা (১৯৩০)

১৫. বিপিন চন্দ্র পাল, আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ (১৯২২)

*১৬. মঈনুদ্দীন হুসায়ন, খেলাফত প্রসঙ্গ (১৯২১)

*১৭. এম. সফি. স্বরাজ-পথে হিন্দু-মুসলমান (১৯২১)

*১৮. রেবতী বর্মণ, তরুণ রুশ (১৯২১)

১৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণের বিদ্রোহ (১৯২৯)

২০. শৈলেশনাথ বিশী, বোলশেভিকবাদ (১৩৩১)

২১. সরোজ আচার্য, নব্য রুশিয়া (১৯২৫)

২২. সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, ভারতের সাম্যবাদ (১৯৩০)

২৩. এস. ওয়াজেদ আলি, বাঙ্গালী মুসলমান [অভিভাষণ] (১৯৩০)

২৪. আবুল হুসেন, বাংলার বল্‌শী (১৯২৫)

*২৫. হেমন্তকুমার সরকার, স্বরাজ কোন পথে (১৯২২)

*২৬. হেমন্তকুমার সরকার ও বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতার সপ্ত সূর্য (১৯২৩)।

তালিকার অনেক বইই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তবে বইয়ের নাম থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই সময়ে প্রকাশিত বইগুলির আলোচ্য বিষয় মোটামুটি এরূপ ঃ ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন, সাম্রাজ্য বিস্তার ও ভারতবাসীর উপর অত্যাচার; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন; অসহযোগ আন্দোলন; হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টা; স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব; রুশ বিপ্লব; সমাজতন্ত্র প্রভৃতি।

---

* তারকা চিহ্নিত বইগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। নাম থেকে বইয়ের বিষয় বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বইয়ের নাম পাওয়া গেছে নিম্নের তিনটি উৎস থেকেঃ

ক) অধীর দে, আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (কলকাতা ঃ সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৯৬২), পৃষ্ঠা ২৩৭, ৪০১, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৭০।

খ) সাঈদ-উর রহমান, বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশ ও প্রসার, ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত,বাঙালীর চিন্তাধারা ঃ আধুনিক যুগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯০), পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯।

গ) আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ২০৪, ৩২৫, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৫৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন ও সাম্রাজ্য বিস্তার

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ইংরেজদের অধীনে চলে যায় ও ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার বহুপূর্ব থেকেই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতবর্ষে আগমন শুরু হয়েছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রের (১৮৬১-১৯৩০) 'ফিরিঙ্গি-বণিক্' গ্রন্থে পর্তুগীজ বণিকদের জল বাণিজ্যপথ আবিষ্কার ও তাদের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পর্তুগীজ নাবিকরা সমুদ্রপথে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্যদেশের বণিকদের উপর (বিশেষ করে আরব দেশীয় মুসলমান বণিকদের উপর) অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে।

ভাস্কো ডা গামা (আনুমানিক ১৪৬৯-১৫২৪) ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মে কালিকটে আসেন। তাঁকে অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে স্পেন, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ইংরেজ বণিকদের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। এরা নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থেই এদেশে আসেনি, সাম্রাজ্য বিস্তারও এদের লক্ষ্য ছিল।

পর্তুগীজ জলদস্যুরা প্রথমে গোয়াতে তাদের কুঠি স্থাপন করে (১৫১০ খ্রীস্টাব্দে)। এর পর ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে তাদের স্থায়ী ঘাঁটি গোয়া থেকে বাংলায় আনে। মুঘল সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) সময় থেকে তারা ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে। জলদস্যুদের বাণিজ্যদ্দেশ্য পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের রূপ নেয়। সাম্রাজ্যবিস্তার করতে যেয়ে তারা এদেশ বাসীর উপর নির্মম অত্যাচার করে।

> "কালিকট-রাজের নৌসেনা গামার নিকট বন্দি-বেশে আনীত হইল। গামা ৮০০ বন্দীর নাসা কর্ণ ও হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তাহা উপঢৌকনস্বরূপ কালিকট-রাজাকে প্রেরণ করিলেন। হতভাগ্য

Dhaka University Institutional Repository

> বন্দিগণ ইহাতেও মুক্তিলাভ করিল না। কাষ্টফলকের আঘাতে তাহাদের দন্তপঙ্‌ক্তি উৎপাটিত হইতে লাগিল। একজন ব্রাহ্মণদূত উপনীত হইবামাত্র, গামা তাঁহার কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া, তাহার স্থলে কুক্কুরের কর্ণ সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণদূতকে কালিকট-রাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। জনৈক মুসলমান বণিক্ এই সকল পাশব অত্যাচারের প্রতিবাদ করায়, গামার প্রধান পোতাধ্যক্ষ তাঁহার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া, তাঁহার মুখে শূকরের মাংস বাঁধিয়া দিলেন। ইতিহাসে এরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার কাহিনী অধিক লিপিবদ্ধ হয় নাই। এইরূপে দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন করিয়া, ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।"[১]

ফিরিঙ্গি-বণিকদের সাম্রাজ্যবিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল কালিকট রাজ ও আরবীয় বণিকগণ। জলদস্যুদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য কালিকট রাজ ও আরবীয় বণিকগণ পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে উভয় পক্ষে অসংখ্য লোক নিহত ও আহত হয়। কোচিন রাজের ন্যায় অন্যান্য ক্ষমতালোভীদের সহযোগিতায় সাম্রাজ্য আগ্রাসী পর্তুগালের সাম্রাজ্য বিস্তার ত্বরান্বিত হয়। তারা এদেশের ধন-সম্পদে নিজ দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলে। তাদের ধন-সম্পদ দেখে স্পেন পর্তুগালকে পরাজিত করে ভারতে আসে। এরপর ভারতবর্ষের ধন-সম্পদের লোভে ওলন্দাজ, ডেনমার্কের দিনেমার ও শেষে ইংরেজরা এদেশে আসে। ইংরেজদের বিজয়ের মধ্য দিয়েই অন্যান্য জাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়; ভারতের স্বাধীনতারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

১ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ফিরিঙ্গি বণিক্, (কলকাতা ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, ১৩৬১), পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

ভারতের স্বাধীনতা

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবাসীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) চেয়েছিলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন; অপরদিকে সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্য নেতৃবর্গ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া কেউ কেউ মনে করতেন জনগণের আত্মশক্তি ও নৈতিক বল প্রভৃতির বিকাশ সাধিত হলে স্বাধীনতা অর্জন সহজ হবে।

'তরুণের বিদ্রোহ'; 'বৈশাখী-বাঙলা'; 'পথ ও পাথেয়'; 'দুর্দিনের যাত্রী'; 'ভারতের সাম্যবাদ'; 'যুগবাণী'; 'কমলাকান্তের পত্র'; 'দু-ইয়ারকি'; 'জাতি গঠনে বাধা-ভিতরের ও বাহিরের ' ও 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ' গ্রন্থ-গুলিতে সশস্ত্র সংগ্রাম করে এবং তা না করেও স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> "স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নাম মাত্রই ত নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই ত একে ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না- এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কোথায় মূল্য ? কার কাছে আছে ? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে, কোথাও এর সন্ধান মিলবে না। সেই অর্গল মুক্ত করার দিন এসেছে। কোন ক্রমেই আর বিলম্ব করা চলে না। কি মানুষের জীবনে, কি দেশের জীবনে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ যখন শূন্য দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে, তখন কিছু না জেনেও যেন জানা যায়, সর্ব্বনাশ অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে।"[২]

---

[২] তরুণের বিদ্রোহ, শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, ত্রয়োদশ সম্ভার, তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ (কলকাতাঃ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,প্রকাশ কাল নেই),পৃষ্ঠা ৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছাড়া ভারতবাসীর গত্যন্তর নেই বলে কাজী নজরুল ইসলামও মনে করতেন। শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি এবং অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলন করে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সে জন্য বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই তা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

> "পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা— নিষেধের বিরুদ্ধে।"[৩]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রবন্ধে আত্মোপলব্ধির মধ্যদিয়ে স্বরাজের পথে অগ্রসর হবার কথা বলেছেন। জাতীয় জাগরণের ভেতর দিয়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন। আর সেই সাথে অপশক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কারণ, এই অপশক্তিই আঘাতের মধ্য দিয়ে ঘুমন্ত দেবতাকে জাগাতে পারে।[৪]

বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই সহিংস আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। সহিংস আন্দোলন ছাড়া ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনের ভেতর দিয়েই তা অর্জন করা যেতে পারে। অন্য একজন লেখক বলেছেন,

> "অস্ত্র ধরিব না, অথচ পরাধীনতার লৌহ-বেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া আসিব। নররক্তে জননী বসুধার বক্ষোদেশ কলুষিত করিব না, অথচ স্বরাজ আমাদের করতলগত হইবে। ছলনা নহে, ব্যথিত মনকে রঞ্জিত প্রবোধে শান্ত করা নহে; স্বারাজ্য ও স্বাধীনতা লাভ করিব- সুনিশ্চিত করিব।"[৫]

---

৩ রুদ্র-মঙ্গল, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ৮৭৬।

৪ দুর্দিনের যাত্রী, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ৮৫৭।

৫ বলাই দেবশর্ম্মা, বৈশাখী বাঙলা (বর্দ্ধমানঃ সারস্বত সাহিত্য মন্দির, ১৯৩০),পৃষ্ঠা ৪১-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

সশস্ত্র সংগাম ছাড়াও স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য দিনে দিনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। যদিও বাইরের দিকে স্বাধীনতার জন্য অদম্য স্পৃহা লক্ষণীয়; কিন্তু অন্তরের অধীনতা থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারছে না। অন্তরের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'লেই বাইরের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া যায় বলে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) মনে করেন।[৬] দেশের সমগ্র জাতি একত্র শক্তি সঞ্চয় করে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়াও স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হতে পারে। দেশের মানুষের ভেতরে স্বদেশপ্রীতির অভাব আছে বলেই সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে অংশ নিতে পারছেনা। হিন্দুদের ছুঁৎ মার্গই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৭] জাতীয়তা ও স্বাধীনতার প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশের প্রতিটি মানুষকে আত্মবলে বলীয়ান হয়ে সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হলেই স্বাধীনতা অর্জন সহজ হবে বলে নলিনীকিশোর গুহ (১৮৮৬-১৯৭৭) মনে করেন।

> "স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ শক্তি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিবে না। কিন্তু জাতিকে শক্তির পথে এতদূর আগাইয়া নিতে হইবে যেখানে দাঁড়াইয়া আমরা সশস্ত্র বিরোধ না করিয়াও আমাদের বাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি।"[৮]

সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়ন করতে পারলেও তাতে করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। সেজন্য সশস্ত্র পন্থা ব্যতিরেক ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে তাতে দেশ ও দশের কল্যাণ সাধিত হবে। এ মতের সমর্থন করে বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন।

---

৬ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জাতি গঠনে বাধা-ভিতরের ও বাহিরের (গ্রন্থের আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি, ১৯২১), পৃষ্ঠা ৩।

৭ ঐ, পৃষ্ঠা ১০।

৮ নলিনীকিশোর গুহ, পথ ও পাথেয় (কলকাতা ঃ আর্য পাবলিশিং হাউজ, ১৩৩৫), পৃষ্ঠা ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

"বিদ্রোহের দ্বারা দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইংরাজদের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হইলেও এ পথে কিছুতেই সত্য গণতন্ত্র স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সে জন্য আবার একদিন ভবিষ্যৎ বংশীয়-দিগকে নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি করিতেই হইবে। এই কারণে আমি সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধী।"[৯]

সশস্ত্র আন্দোলন এবং আত্মজাগরণ ছাড়াও অহিংস-অসহযোগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। এঁরা গান্ধীর অনুসৃত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী তাঁরা বিশ্বাস করতেন অহিংস-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি আনতে সক্ষম হবে।

"অহিংস-অসহযোগ দ্বারা কেবল যে পরাধীনতার দুঃখেরই নিবৃত্তি হইবে তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্ব প্রকার দুঃখেরই নিবৃত্তি হইবে।"[১০]

এর বিপরীত মতও রয়েছে কারো কারো লেখায়। অসহযোগ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে গণজাগরণ ঘটানো যায়; আর তা হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় বলে চারুচন্দ্র রায় (১৮৭০-১৯৪৫) মনে করেন।

"অসহযোগ একটা প্রতিশেধক defensive action মাত্র। এ defensive action থেকে জয়শ্রী লাভ করা যেতে পারে না। অসহযোগ একটা মাঝামাঝি পথ-সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র- তা' থেকে জয়শ্রী লাভ কেউ কখন করতে পারেনি।"[১১]

---

[৯] বিপিন চন্দ্র পাল, আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ, (১৯২২), সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় রচিত বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, (কলকাতা ঃ জি. এ. ই. পাবলিশার্স, ১৯৯১) গ্রন্থের ২৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

[১০] সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ভারতের সাম্যবাদ (কলকাতা ঃ খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৯৩০), পৃষ্ঠা ৩৯।

[১১] চারুচন্দ্র রায়, কমলাকান্তের পত্র (চন্দন নগর ঃ প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ১৩৩০), পৃষ্ঠা ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাঙালীরা মনে প্রাণে self Government কে চেয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তা চায়নি। সেজন্যই বাঙালী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের তীব্র মতপার্থক্য ছিল।প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) মতে -

> "কংগ্রেসের গ্রীনরুমে যাঁদের প্রবেশাধিকার আছে তাঁরাই জানেন যে, সেখানে কোনো বাঙালী, কংগ্রেস-লীগের দুহাতে গড়া-স্বরাজ মাথা পেতে নিতে পারেন নি; কেন না তা গ্রাহ্য করে নেবার কোনই বৈধ কারণ নেই।"[১২]

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কংগ্রেসের ভেতরে বিভিন্ন মতভেদ ছিল। নেতাদের মধ্যে কেউ ইংরেজের পরোক্ষ শাসনের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন; আবার কেউ কেউ ইংরেজের দান হিসেবে স্বরাজ লাভ আবার অনেকেই ইংরেজ বর্জিত স্বচ্ছ স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। বাঙালীরা সব সময়ই ইংরেজ বর্জিত স্বচ্ছ স্বাধীনতার পক্ষপাতি ছিল। শেষপর্যন্ত কংগ্রেস বাঙালীদের পক্ষাবলম্বন করে। এ প্রসঙ্গে নলিনীকিশোর গুহ বলেছেন -

> "ভারতবর্ষের কংগ্রেস এই স্বাধীনতাকে বর্ত্তমান ভারতের কাম্য আদর্শ বলিয়াছেন। অর্থাৎ এতদিনে আমরা যাহা মানুষের কাম্য তথা ধর্ম্ম, তাহাই নিজেদের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। স্বীকার করিয়াছি, ইংরেজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষই আমাদের আদর্শ।"[১৩]

---

[১২] প্রমথ চৌধুরী, দু-ইয়ারকি, (কলকাতা ঃ ১৯২০), পৃষ্ঠা ৪৬।

[১৩] পথ ও পাথেয়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

চার

অসহযোগ আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় অসমর্থ ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে। রাওলাট আইন (১৯১৯), পাঞ্জাবে গণহত্যা (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯) এবং তুরস্কের খলিফার কর্তৃত্ব হরণ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশের উত্তেজনাময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গণ-আন্দোলনমুখী স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করায় অগ্রণী ছিলেন গান্ধী। তিনি প্রথম থেকেই সহিংস আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধোত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর উত্থাপিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে সাত দফা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান; সরকারের মনোনীত সদস্যদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হতে পদত্যাগ; সর্বপ্রকার জাঁকজমকপূর্ণ সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন; সরকার পরিচালিত স্কুল কলেজ বয়কট; ব্যবহারজীবী ও মামলাকারীদের ব্রিটিশ আদালত বর্জন; মেসোপটেমিয়ায় ব্রিটিশ সামরিক চাকুরী প্রত্যাখ্যান; আইন সভার নির্বাচন ও ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট ইত্যাদি প্রস্তাব ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[১৪]

অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্থায়ী ছাপ রেখেছে। অহিংস-অসহযোগ দ্বারাই পরাধীনতার দুঃখের নিবৃত্তির পাশাপাশি মানুষের মানসিক দুঃখের নিবৃত্তি লাভও সম্ভব বলে এই ধারার অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন। তাঁরা প্রেম এবং ভালবাসার মধ্যদিয়ে মানুষের মন জয়ের

---

[১৪] সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ (কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষপাতী ছিলেন। মন বা হৃদয়জয়ের মধ্যদিয়ে সমগ্র জাতিকে একত্রিত করে অহিংসার আন্দোলন পরিচালনা করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।

> "জয় যদি করিতে হয় তবে মন জয় করাই একান্ত কাম্য। যে ব্যক্তি মনকে বশীভূত করে, নিঃশেষে তাহার দুঃখের নিবৃত্তি হয়, মোক্ষ তাহার অধিগম্য হয়। সামাজিক মনকে বশ করিলে সামাজিক দুঃখও নিঃশেষে অন্তর্হিত হইবে। প্রেমই সেই বশীকরণ মন্ত্র, অহিংসা তাহার নামান্তর।"[১৫]

গান্ধী ভারতবর্ষে অহিংস-অসহযোগের মধ্যদিয়ে স্বরাজ লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মানুষের সার্বজনীন দুঃখ নিবারণের জন্য দেশের প্রাচীন কালের ঋষিগণ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, গান্ধীও ইংরেজের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে সে স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি কারো প্রতি হিংসা না করে অপরের হিংসার প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, শক্তি দিয়ে শক্তিকে প্রতিহত করা যায়; কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। প্রেম-ভালবাসা দিয়েই তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন পুরোপুরি সার্থক না হলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে।

স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে প্রথমে জনমনে আত্মজাগরণ ঘটাতে হবে। আত্মজাগরণ না ঘটলে কোন আন্দোলনই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অসহযোগ আন্দোলনে অনেক লোকই অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু অন্তরে জোর না থাকায় তারা আন্দোলন থেকে দূরে সরে পড়েন। ফলে অসহযোগ আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কাজী নজরুল ইসলামের মতে :

---

[১৫] ভারতের সাম্যবাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

"অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনা নিয়ে নেমেছিলেন বলে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন না, আপনি সরে পড়লেন।"[১৬]

তবে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন দেশের আপামর জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। দেশের অনেকেই এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল যে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে আন্দোলন করে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দুর অভাব ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের (১৯১৯-১৯২৪) সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যাবার তাঁর সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে মজবুত না ক'রে শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে চাঙ্গা করে তুলেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে দেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি স্থান পায়নি বলে তারা এর থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যায়।[১৭] অন্যদিকে দেশে সহিংস ঘটনা বেড়ে গেলে গান্ধী অসহযোগ কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যাহার করে নেন। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গান্ধী দেশের কৃষক-শ্রমিক-রাজনীতিবিদ সহ সকল মানুষকে একত্র করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গান্ধী চরকা কেটে স্বরাজ লাভের যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, কেউ কেউ সে আন্দোলনকে একটা বড় ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে করেছেন।

"গান্ধীজীর ভুল হ'য়েছে বল্লে হয়ত দেশসুদ্ধ লোক আমার উপর খড়্গ হস্ত হ'য়ে উঠবে, আমার তা'তে বিশেষ এসে যাবে না। আমি বলতে বাধ্য-গান্ধীজীর ভুলই হয়েচে, এবং খুব বড় রকমেরই ভুল হয়েচে।"[১৮]

---

[১৬] রুদ্র মঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭৮।

[১৭] ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬২।

[১৮] কমলা কান্তের পত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

চরকার পক্ষে যুক্তি দেখাতে যেয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, চরকায় সূতা কেটে তাঁত শিল্পের প্রসার ঘটালে দেশে বেকারত্বের হার কমে যাবে এবং মানুষের দুঃখ কষ্টেরও কিছুটা লাঘব হবে। এ প্রসঙ্গে আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) 'বাংলার বল্‌শী' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> "চরকা ও তাঁত প্রবর্ত্তিত হ'লে কলের নিরবচ্ছিন্ন শত দুঃখকে দূরে রাখা হবে-চাষার অবসর সময়ে কাজ দেওয়া হবে-অল্প ব্যয়ে প্রত্যেকেই শান্তির সঙ্গে চরকা ও তাঁত ঘরে ঘরে খাড়া করতে পারবে-আর কলি যুগের যে অনবচ্ছেদ ছবি-অবিরাম স্রোতের মত ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি ধীরে ধীরে মুছে যাবে-ভিক্ষুকেরা অনেকেই চরকার কাজ করতে পারবে।"[১৯]

অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি এতে রাজনৈতিক তাৎপর্য লক্ষ্য করেননি। তবু তরুণদেরকে তাতে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

> "নানা অসম্মানে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ-পণ্য বর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে; সঙ্কল্প তাদের সিদ্ধ হোক। বাঙলার তরুণের দল, এই সংঘর্ষে তোমরা তাদের সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করো। কিন্তু অন্ধের মত নয়; মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়; কংগ্রেস সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করে বেড়ালেও নয়।"[২০]

যাহোক, অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল গণ-জাগরণে ও গণ-আন্দোলনের প্রকাশে। এ আন্দোলনে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সরকারের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছিল। তাছাড়া কংগ্রেস সংগঠনেও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। অসহযোগ কর্মসূচীর বড় প্রভাব পড়ে নতুন-নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। আন্দোলনের প্রভাবে

---

[১৯] আবুল হুসেন, বাংলার বল্‌শী (ঢাকা ঃ তরুণ পত্র কার্যালয়, ১৩৩২), পৃষ্ঠা ৫৯।

[২০] তরুণের বিদ্রোহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা, মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং গুজরাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া, সারা ভারতের গ্রাম ও শহরে অনেক স্কুল ও কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রভূমি হয়েছিল।[২১]

পাঁচ

হিন্দু-মুসলমান মিলন

গৌতম বুদ্ধ সাম্য ও মৈত্রীর বাণী সমগ্র বিশ্বের মানুষকে শুনিয়েছিলেন। সেই সাম্য ও মৈত্রীর বাণী এদেশে সর্বাংশে সফল হয়নি। ইংরেজরা সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাস্প ছড়িয়ে সাম্য ও মৈত্রীর বাণীকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত করতে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে জিইয়ে রেখেছিল। 'সংকলন'; 'নবপর্যায়'; 'যুগবাণী'; 'রুদ্র-মঙ্গল'; 'ভারতের সাম্যবাদ'; 'ফিরিঙ্গি-বণিক্' ও 'বাঙালী-মুসলমান' [অভিভাষণ] গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান মিলন, সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা বিরাজমান ছিল। মধ্যযুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন সম্পর্কে অনেকে লিখেছেন।[২২] সে সময়ে আরবীয় বণিক গণের সঙ্গে এদেশীয় হিন্দু সমাজের ঐক্য সাধিত হয়েছিল। পর্তুগীজরা ভারতে এসে

---

[২১] ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬০।

[২২] একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে, ডঃ মুসা কালিম রচিত 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (কলকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮)।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি নষ্ট করতে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বন্ধনকে ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়।

> "মুসলমান গণকে চির নির্ব্বাসিত না করিলে, কালিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। হিন্দু নরপতি মুসলমান প্রজাবর্গের বাণিজ্য রক্ষার্থ সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত না হইলে, কালিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু কালিকট-রাজ রাজধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নগর রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না।"[২৩]

মোগল সম্রাট আকবর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধন করতে 'দীন-ই-ইলাহি' (বা দিব্য বিশ্বাস) নামে নতুন ধর্মমতের প্রবর্তনা করেন। তিনি ভারতের প্রধান দুই ধর্মমতাবলম্বীগণের ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরও আগে কবীর (আনুমানিক ১৩৮০ থেকে ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দ) ভক্তিবাদের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। কবীর ছিলেন মুসলমান তাঁতি। তিনি প্রচার করতেন যে, ঈশ্বর রামও নন আল্লাহ্‌ও নন; স্রষ্টা প্রতিটি মানুষের অন্তরে বিরাজমান। তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ চান না, চান মানুষে মানুষে মৈত্রী।[২৪]

ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অটুট ছিল। ইংরেজগণ নিজেদের ক্ষমতাকে ঠিক রাখার লক্ষ্যে এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। দুই সম্প্রদায়ের শাসকদের মধ্যে মধ্যযুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ হলেও সে যুদ্ধ কখনো সাম্প্রদায়িক বিভেদের আকার ধারণ করেনি। হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপ ছিল না, ইংরেজরাই মুসলমানকে হিন্দুদের বিরুদ্ধ করেছে।[২৫]

---

[২৩] ফিরিঙ্গি বণিক্, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭।

[২৪] কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মস্কো ঃ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮২), পৃষ্ঠা ৩০৭।

[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন ঃ সমস্যা (কলকাতা ঃ বিশ্ব ভারতী, ১৩৩২), পৃষ্ঠা ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির উপরই নির্ভর করে দেশের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতি। সমাজের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অসাম্প্রদায়িক ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেয়। ঐক্য বিনষ্টকারীরা নিজ বিবেক বোধকে বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সৃষ্টি করে। প্রকৃত অর্থে ঐক্য বিনষ্টকারীদের বিশেষ কোন ধর্ম নেই। পাপাচরণ করাই হচ্ছে তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

> "হিন্দু সমাজের পাপাচারীরাই হিন্দু সমাজ নহে, তেমনি মুসলমান সমাজের পাপাচারীরাই মুসলমান সমাজ নহে। সঙ্গে সঙ্গে সাধু হিন্দু ও সাধু মুসলমানের চরিত্রের গৌরবে আমরা পরস্পরকে মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করিতে পারি এবং তাহার ফলে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারি।"[২৬]

হিন্দু আর মুসলমান সমাজের চিন্তা-ভাবনার একমুখী ধারা বাউল-সাহিত্য ও মুসলমান-বৈষ্ণব-কবিদের রচনার ভেতরে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগে সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের এই ধরণের মিলনের মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে ক্ষিতিমোহন সেনের রচনায়।[২৭]

অতীতের চিন্তা-চেতনাকে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ না করার ফলে তার মধ্যে বিকৃত বুদ্ধির সৃষ্টি হয়েছে। আর এই বিকৃত বুদ্ধিই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করেছে। দেশ ও সমাজের শান্তি এবং মঙ্গলের জন্য এদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা প্রয়োজন। দেশে সম্প্রীতির এই বন্ধন অটুট থাকলে তা অন্যান্য দেশের জন্যও অনুকরণীয় হবে।

> "প্রীতি সহানুভূতিপূর্ণ, ভ্রাতৃত্বের অটুট এক বন্ধনে, এই বাঙ্গালী জাতিকে বাঁধতে হবে। এ কাজ যদি করতে পারি, জগতের সামনে তা

---

[২৬] ভারতের সাম্যবাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২০।

[২৭] কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ ঃ অতীতের সমাজ (ঢাকা ঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

> হলে মাথা তুলে আমরা দাঁড়াতে পারবো; আশা এবং আনন্দে আমাদের জীবন উজ্জ্বল হবে। বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ভারতের অন্যান্য দেশের লোক তখন আমাদের দিকে চাইবে, আর ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে। বাঙ্গলাদেশ নব্য ভারতের তীর্থে পরিণত হবে।"[২৮]

সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে দেশের অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এতে করে দেশের অসাম্প্রদায়িক ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেশের অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থান্ধতা পরিহার করে সমাজ জীবনে অসাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটাতে হবে। আর এর উপরই নির্ভর করছে দেশের মঙ্গল ও উন্নতি। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন -

> "এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান -ঐ শ্মশান ভূমিতে-শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন।"[২৯]

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে অবসন্ন হয়ে মানুষ পশুতুল্য হয়ে পড়েছে। তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ধর্মীয় সংকীর্ণতায় তাদের জ্ঞাননয়ন তমসাচ্ছন্ন। সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনার অভাবে তারা একে অপরের উপর আঘাত হানছে। ফলে সমাজ ও দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তে পশুবৃত্তিই আজ তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

---

[২৮] বাঙ্গালী মুসলমান [অভিভাষণ], এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৩৯।

[২৯] যুগবাণী, নজরুল রচনাবলী প্রথম খন্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ৮১১।

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই।"[৩০]

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, উচ্চ-নীচ সমস্যা জন-জীবনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। ফলে দেশের মঙ্গল ও উন্নতি ব্যহত হচ্ছে। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) হিন্দু-মুসলমানের মিলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের উপরে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে জড়তাগ্রস্ত মানব জীবনে বীর্য সঞ্চারিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[৩১]

ছয়

সমাজতন্ত্র

লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) নেতৃত্বে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে রাশিয়ায় বিপ্লবের মধ্যদিয়ে বিশ্বে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব শুধু ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভারতেও এসে পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, রুশ বিপ্লব ও বোলশেভিকবাদ প্রভৃতিকে জনপ্রিয় করার জন্য সেকালে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী রুশিয়া'; 'কার্ল মার্কস'; 'রুশ জাতির কর্মবীর'; 'লেনিন ও সোভিয়েট'; 'লেনিন'; 'বোলশেভিকবাদ'; 'নব্য রুশিয়া'; 'তরুণ রুশ' প্রভৃতি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩২] তবে অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল পরিচিতি মুলক ও অনুবাদ। মার্কসের তত্ত্বকে সৃষ্টিশীল ভাবে ভারতের ও বাংলার সমস্যা বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেও

---

৩০ রুদ্র-মঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮৪।

৩১ নবপর্যায়, দ্বিতীয় খন্ড ঃ নেতা রামমোহন, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা ঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৩১৬।

৩২ দ্রষ্টব্য ঃ (ক) সাঈদ-উর রহমান, বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশ ও প্রসার, ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, বাঙালীর চিন্তাধারা ঃ আধুনিক যুগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯০), পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'নব্য রুশিয়া'; 'বোলশেভিকবাদ'; 'ভারতের সাম্যবাদ'; 'যুগবাণী'; 'রুদ্র-মঙ্গল' ও 'বাংলার বল্‌শী' গ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

জারতন্ত্রের ধ্বংস সাধন এবং বোলশেভিকগণ কর্তৃক রাশিয়ার ক্ষমতা দখল বিশ্বের ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জারতন্ত্রের কঠোর দমননীতি যখন মুক্তি পিপাসু রুশ নরনারীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে বাধা প্রদান করে, তখন হতেই বোলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত হয় গুপ্ত আন্দোলন। আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ক্ষমতা দখল করে বোলশেভিকগণ বিশ্বের সমগ্র মেহনতী মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। সে আহ্বানের প্রতিধ্বনি রয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের যুগবানীতে।

> "মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির। ভাঙো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে ?"[৩৩]

বোলশেভিক বিপ্লবের দু'টি লক্ষ্য ছিল ঃ স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের ধ্বংস সাধন ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজ যাঁরা সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কোনদিনই জারতন্ত্রের সমূলে উচ্ছেদ কামনা করেনি ও কোনদিনই গণতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করেনি।[৩৪] শাসকদলের অধিকাংশ লোকই ছিলেন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের। এ কারণেই তারা কখনো জারতন্ত্রের স্বপ্নকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। ফলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। বোলশেভিকগণ মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায় পরিচালিত অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করে শাসনযন্ত্র নিজেদের অধিকারে আনে। পরবর্তী সময়ে তারা ধনিক সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করেছে,

---

[৩৩] যুগবাণী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮১০।

[৩৪] নব্য রুশিয়া, সরোজ আচার্য রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, (কলকাতা ঃ পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা ৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সরোজ আচার্য (১৯০৫-১৯৬৮) 'নব্য রুশিয়া' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> "সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দলের 'রাজ্য বিস্তার নীতির' বিরুদ্ধে বলশেভিকগণ তীব্র প্রতিবাদ করেন। ---- এই সময় হইতেই মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বলশেভিকগণের মহাঅভিযান আরম্ভ হইল। ---- লেনিন, ট্রট্স্কী প্রমুখ বলশেভিক নেতাগণ সর্ব্ব প্রকার বাধা ও প্রতিবাদ তুচ্ছ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।"[৩৫]

বোলশেভিকদের আচরণে ধনিক শ্রেণী থেকে শুরু করে দেশের অনেক মানুষ, বিশেষ করে বিদ্বৎ সমাজের কেউ কেউ বেশী দুঃখ বোধ করেছেন। বোলশেভিকগণ দেশের বুদ্ধিজীবীদের অনেককে হত্যা করে। কৃষক সমাজও তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। এ সকল কারণে সাধারণ কৃষক সমাজের একটি অংশ বোলশেভিকদের ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তারা জার যুগের পক্ষপাতীও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে শৈলেশনাথ বিশী বলেছেন -

> "তাহারা জারযুগের পক্ষপাতী। এই যে বোলশেভিকদের প্রতি কৃষকদের ঘৃণা, তাহার কোন প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।"[৩৬]

খাদ্যদ্রব্যের অভাব বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে জন সাধারণের প্রতিবাদের কারণ। তাছাড়া কৃষকরা ফসলের ন্যায্য অধিকারও দাবী করে বোলশেভিকদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

বিপ্লবের প্রথম কয়েক বছর বিপ্লবীরা পুরোপুরি রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন ব্যবস্থা কর্মসূচী মোতাবেক হয়নি। ফলে অনেক মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। সেগুলি ধরা পড়েছে এখানে।

---

[৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৩।

[৩৬] শৈলেশনাথ বিশী, বোলশেভিকবাদ (কলকাতা ঃ বুক কোং, ১৩৩১), পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

"বোলশেভিকবাদের যদিও কখনও পতন হয়, তবে ক্রমওয়েলের যে কারণে পতন হইয়াছিল, তাঁহারও সেই কারণেই হইবে। জনসাধারণ এত কঠোরতা সহ্য করিবে না, তাহাদের প্রমোদাভিলাষীচিত্ত সংযমের সহস্র শৃঙ্খলেও বাঁধা থাকিবে না।"[৩৭]

বোলশেভিকদের ক্ষমতারোহণের পর হতে বেশ কিছুদিন দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুশৃঙ্খল-ভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হবার পর থেকে দেশে কলকারখানা স্থাপনের পাশাপাশি সুকুমার শিল্পের বিকাশেও তারা সহযোগিতা প্রদান করেন। শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতির পাশাপাশি শিল্পীর মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজতন্ত্রী নেতারা ক্ষমতায় গিয়ে তাদের পূর্বের ধ্যানধারণা পালটিয়ে দেন। ক্ষমতার আস্বাদে পূর্বের ধারণা পরিবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। বোলশেভিকরাই যদি রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক থাকেন, তবে তাদের সমাজতন্ত্রের ধারণা ক্রমে ক্রমে মুছে গিয়ে সেস্থানে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বেচ্ছা-চারিতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করবে বলে শৈলেশনাথ বিশী মনে করেন।[৩৮]

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহিংসা কাম্য নয় বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন। জোর করে চাপিয়ে দেয়া কোন কিছু বেশী দিন স্থায়ী হয় না। অহিংস প্রেম-ভালবাসা দিয়েই মানুষের মনকে জয় করতে হয়। শৈলেশনাথ বিশী 'বোলশেভিকবাদ' গ্রন্থে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহিংসতার বিরোধিতা করেছেন।

"আমিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং জগতে সুপরিচালিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্প। কিন্তু আমি রক্তপাত, যুদ্ধ ও বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোরতর বিরোধী।"[৩৯]

---

[৩৭] ঐ, পৃষ্ঠা ২৪-২৫।
[৩৮] ঐ, পৃষ্ঠা ৩০।
[৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম 'রুদ্র-মঙ্গল' গ্রন্থে কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে তাদের শ্রমের ন্যায্য পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন; এবং সেইসাথে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করে মেহনতী মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

> "জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদ পিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের এ-লাঙল আজ-বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক উলটে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ-ধুলায় লুটাও অর্থ পিশাচ বল-দর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা।"[৫০]

বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনিক শ্রেণীরা মেহনতী মানুষের শ্রমে আরো ধনী হয়ে উঠছে। কৃষক-শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্বতর হয়ে পড়ছে। এ সঙ্কটময় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা কৃষক-শ্রমিকের সম্মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। এ বিপ্লব দেশব্যাপী বর্তমান আর্থিক অবস্থার অসমতা দূর করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। আবুল হুসেনের মতে :

> "যতদিন শ্রমী তাহার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পাইবে এবং যতদিন জমিদার কৃষকের জমির উর্ব্বরা শক্তিকে প্রখর করিয়া না তুলিবে-যতদিন চাষা তাহার সমস্ত অধিকার স্বাধীনতা ফিরিয়া না পাইবে-যতদিন জমিদার নিজে উৎপাদক না হইবে- যতদিন তাহার বিলাস ভোগ-তৃষ্ণা বিদূরীত না হইবে-যতদিন কৃষকের উৎপন্ন শষ্যকে লইয়া জমিদার বিলাসিতার উপকরণ করিয়া অপচয় করিবে, ততদিন শান্তির

---

৫০ রুদ্র মঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

আশা আকাশ-কুসুম থাকিয়া যাইবে-ততদিন প্রতিমুহূর্ত্তে বিপ্লবের আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক।"[৪১]

বিপ্লবের ভাল দিকগুলি সমর্থন করলেও বিপ্লব-পরবর্তী কালের সমাজেও কোন-কোন অংশের ওপর জবরদস্তিমূলক আচরণ এদেশের কোন কোন লেখক সমর্থন করতে পারেনি। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাধ্যতামূলকভাবে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অস্ত্রের মুখে মানুষের বাকস্বাধীনতা হরণ করে রাজা, ধনিক ও বুদ্ধিজীবীর ধ্বংস সাধন করে কর্মবাদকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[৪২] এতসব অন্যায় অত্যাচার সত্ত্বেও রাশিয়াতে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টার পাশাপাশি ভেদ-বুদ্ধি ও শ্রেণী বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে;[৪৩] এবং পাশাপাশি রাষ্ট্রে কলকারখানা স্থাপন করে মানুষের বেকারত্ব নিবারণ ও সুকুমার শিল্পকে রক্ষা করতেও রাষ্ট্র সচেষ্ট। সমাজতন্ত্রের কঠোর নিয়মের ফলে রাশিয়ার সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার সাথে সাথে সমাজের শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

> "অন্যদেশের মত সেখানে বারবণিতার প্রাদুর্ভাব নাই, এবং নারীর উপর কখনও অত্যাচার হয় না - সকল সময়ই নারী নিরাপদ। এক কথায়, সেখানকার শৃঙ্খলা ও নৈতিক উন্নতিই আমাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে।"[৪৪]

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সমাজতন্ত্রের রূপ ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। গীতার কর্মযোগের আদর্শে সকল কাজ সম্পন্ন হতো। ব্যক্তির স্বার্থবুদ্ধির বাইরে জগতের মঙ্গল সাধনাই ছিল ভারতের সাধনা। ঋষিগণ নির্লিপ্তভাবে রাজ কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। এ শিক্ষার মধ্যদিয়ে বিশ্বপ্রেম, সাম্য ও সমাজতন্ত্রের রূপ ফুটে উঠে। ভারতের এ সকল কর্মযোগী

---

৪১ বাংলার বলশী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭১।
৪২ ভারতের সাম্যবাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬।
৪৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৯২।
৪৪ বোলশেভিকবাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাজাদেরকে সোসালিস্টদের আদি পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্তের (১৮৮২-১৯৭৯) মতে ঃ

> "আধুনিকতম ভারতবর্ষের কর্ম্মবাদ রাশিয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইটালীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহা ভারতবর্ষের পুরাতন কর্ম্মবাদ। রাশিয়া যেখানে পৌঁছিয়াছে, ইটালীর কর্ম্মবাদ তদপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং ভারতের কর্ম্মবাদ তাহারও উর্দ্ধে।"[৪৫]

প্রাচীন ভারতে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ভেতরেই বর্তমান রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের আদর্শ রয়েছে। সেই সাথে বড় ধরনের কিছু পার্থক্যও তাতে আছে। ভারতের সমাজতন্ত্রের রূপ ছিল মানুষের হৃদয় হতে উৎসারিত আন্তরিকতা, অপরদিকে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের রূপ হচ্ছে জোর করে অস্ত্রের মুখে সাম্য ও সংযমের প্রতিষ্ঠা করা। রাশিয়ার ন্যায় ইটালিতে মুসোলিনী (১৮৮৩-১৯৪৫) একনায়কত্ব মূলক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন। তিনি রাশিয়ার মতো মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেননি। এতসব কিছুর পরও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভেদ-বুদ্ধি ও শ্রেণী বৈষম্য দূর করে সমাজ জীবনে শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিক উন্নতি সাধনে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

---

[৪৫] ভারতের সাম্যবাদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম

আলোচ্য দশকটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ধর্মবিষয়ক আলোচনা ও তৎপরতার ক্ষেত্রেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে ইংরেজরা যখন রাজনৈতিক দিক থেকে প্রচন্ড রকম চাপের সম্মুখীন, এবং রাশিয়ায় সাম্যবাদী শক্তির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় ধর্ম বিষয়ে আলোচনা বিশেষভাবে শুরু হয়।

এই দশকে হিন্দু ও মুসলমানকে যৌথভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারাও দেখা গিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন যুগও একই সময়ে শুরু হয়েছিল। দুই আন্দোলনের নেতাদের বৃহৎ অংশ ধর্ম-জীবনের পুনরুজ্জীবনের আগ্রহী ছিলেন। এ সময়ে ধর্ম বিষয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

১. অশ্বিনীকুমার দত্ত, কর্ম্মযোগ (১৩৩২)
২. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মহাপূজা (১৩২৮)
৩. এয়াকুব আলী চৌধুরী, মানব-মুকুট (১৯২২)
৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (১৯২৬)
৫. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাল-পার্ব্বণ (১৩৩১)
৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (১৯২৫)
৭. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, পারস্য-প্রতিভা, প্রথম খন্ড (১৩৩০)
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন (১৩৩২)
৯. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা (১৩২৭)
১০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্ত-পরিচয় (১৩৩১); কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর (১৩৩২); অবতারতত্ত্ব (১৩৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

কর্মযোগ, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, শক্তিসাধনা, জ্ঞান ও যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির মহিমা ও বৈজ্ঞানিকতা তুলে ধরে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ; প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন; ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নীতিমূলক উপদেশ প্রচার ও ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যদিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন করা প্রভৃতি প্রসঙ্গ বইগুলিতে আলোচিত হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত রচনাগুলিতে মহাপুরুষদের চরিত্রকে মহিমান্বিত করে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানও বইগুলি লেখার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল।

দুই

কর্মযোগ ও জন্মান্তরবাদ

কর্মের মধ্যদিয়েই এ পৃথিবীতে সকলে বেঁচে আছে। কর্ম ছাড়া কেউ পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না। কর্মই হচ্ছে সৃষ্টির ভিত্তি। বিশ্ব স্রষ্টাও সৃষ্টি, পালন ও সংহারের ভেতর দিয়ে তাঁর নিত্য কর্ম সম্পাদন করে চলছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

কর্ম দু'প্রকার - সকাম ও নিষ্কাম। নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে সাত্ত্বিক কর্ম। আর এ কর্মের ভেতর দিয়েই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। বিশ্বমানবের কল্যাণে কর্ম করতে হলে তা নিষ্কামভাবে করাই শ্রেয়। কর্ম করে তার ফল লাভের আশা না করাই হলো নিষ্কাম বা সাত্ত্বিক কর্ম। পৃথিবীতে প্রাণিগণকে স্ব-স্ব কর্মফল অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়। কর্মের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। ভাল কর্মের জন্য পুণ্য ও মন্দ কর্মের জন্য পাপের অংশীদার হতে হয়।

কর্মগুণে বিভূষিত হয়ে আজও বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষগণ জগতে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও পূজনীয়। তাঁরা ধৃতিবলের পরিচয় দিয়ে জগৎ সংসারে শ্রদ্ধার আসনে উপনীত হয়েছেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের (১৮৫৬-১৯২৩) 'কর্ম্মযোগ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"মহাপুরুষ মহম্মদ ধৃতিবলের কী প্রকৃষ্ট পরিচয়ই দিয়াছিলেন। ধৃতিবলে মার্টিন লুথার অসীম প্রতাপশালী পোপের ঘোষণাপত্র জনগণসমক্ষে নিঃসঙ্কোচে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ------- ধর্ম্মার্থ কি দেশ কল্যাণার্থ ত্যক্তজীবিত মহাত্মগণ ধৃতিবলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।" [১]

মানবের কর্ম ত্রিবিধ-ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা। কর্মদেবতারা জীবের কর্মানুসারে তাদের বিধানগুলি কাজে পরিণত করেন। কোনরূপ হিংসার বশবর্তী হয়ে কারোর কর্মের বাইরে কোন কাজের ফল চাপিয়ে দেন না। কর্মদেবতারা কর্মের প্রবর্তক নন; তাঁরা কর্মের চালক মাত্র।

কর্মবাদ মূলত ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাল কর্মের ফলে সুখ ও মন্দ কর্মের ফলে দুঃখ-পুণ্যাত্মার পক্ষে সুখ ভোগ ও পাপীর পক্ষে দুঃখ ভোগ-এই কর্মের বিধান। চিন্তা ও কামনা এক মন হতে অন্য মনে সঞ্চারিত হতে পারে। সুচিন্তা ও সুবাসনার দ্বারা যেমন অপরের ইষ্ট সাধন করা সম্ভব, তেমনি দুশ্চিন্তা ও দুর্বাসনার দ্বারা সেইরূপ অপরের অনিষ্ট সাধন করাও সম্ভবপর হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২) 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"মানুষের অবস্থা জন্মান্তরীণ সুকৃত দুষ্কৃতের ফল। ধ্রুবের জন্মান্তর-কৃত পুণ্য সঞ্চয় ছিল না। সেই জন্য সে রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টের নিয়মন করা যায়। ক্রিয়মাণ সুকৃত দ্বারা সঞ্চিত দুষ্কৃতের রোধ করা যায়।"[২]

ব্যক্তিগত কর্মফল কখনো কখনো জাতিগত কর্মফলেও পর্যবসিত হয়। জাতি ব্যক্তির সমষ্টি। ব্যষ্টি-মানুষের কর্ম ও তার বিপাক আছে, সেইরূপ সমষ্টি-মানুষ-জাতিরও কর্ম এবং তার বিপাক আছে। কর্ম দেবতার স্পর্শে এক জাতি

---

[১] কর্ম্মযোগ, অশ্বিনীকুমার রচনা সংগ্রহ, বদিউর রহমান সম্পাদিত (বরিশাল, জীবনানন্দ একাডেমী, ১৯৯২), পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১।

[২] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর (কলকাতা ঃ ফণিভূষণ দত্ত প্রকাশিত, ১৩৩২), পৃষ্ঠা ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য জাতিকে বিজিত করেন, এক জাতির দ্বারা অন্য জাতিকে দমিত করেন, একজাতির সংস্পর্শে অন্যজাতিকে উন্নত করেন। এভাবেই জাতীয় কর্মের সামঞ্জস্য বিহিত হয়। ভারতবর্ষের মানুষের কৃত কর্মের ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের পরাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছে। জাতির কর্ম ঋণের জন্যই ব্রিটিশ ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

> "ব্যক্তিগত কর্ম্মের ন্যায় জাতিগত কর্ম্মেরও ফলভোগ করিতে হয়। ---------- যেমন ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ। যখন ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যার্থে এদেশে প্রথম আগমন করে, তখন আরও কয়েকটি প্রবল ইউরোপীয় জাতি এই দেশে প্রবিষ্ট হইয়া কুঠিয়াল্পি করিতেছিল। তাহাদের অনেকেরই, বিশেষতঃ ফরাসীদিগের, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজ্যবিস্তার করে, সে সম্বন্ধে বৃটিশ রাজপুরুষদিগের এবং বৃটিশ জাতির আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অথচ বিধাতা ঘটনাচক্র এমন ঘূর্ণিত করিলেন যে, অনেকটা বাধ্য হইয়াই ইংলন্ডকে ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইল।"[৩]

কর্মবাদে আস্থা স্থাপন করলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, আর্যরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করে অনার্যদের উপর যে অকল্পনীয় অত্যাচার করেছিল, বর্তমান ভারতবর্ষের মানুষ তারই ফল ভোগ করছে। এ প্রসঙ্গে 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "আমাদের আর্য্য পূর্ব্ব-পিতৃগণ এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া সে যুগের 'নেটিভ' অনার্য্যদিগের প্রতি যে নির্য্যাতন ও নিপীড়ন করিয়াছিলেন, আমরা এতদিন ধরিয়া সেই জাতীয় অপকর্ম্মের ফল-ভোগ করিতেছি।"[৪]

---

[৩] ঐ, পৃষ্ঠা ৬০।
[৪] ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চিত কর্মের ফলে মানুষের প্রকৃতি বা চরিত্র গঠিত হয় এবং প্রারব্ধ কর্মের ফলে জাতি, আয়ু, ভোগ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক-অবস্থা নিয়মিত হয়। কর্মবাদে বিশ্বাসী না হয়েও মানুষ চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা সুখ-ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষই এতে বিশ্বাসী।

> "প্রযত্ন, পৌরুষ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োগ করিলে সকলেই সুখ-সম্পদ্ ভোগ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে। এক কথায়, মানুষের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টাধীন, ইচ্ছা-সাপেক্ষ। এই মতের পোষকতা করিয়া ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন (Tennyson) বলিয়াছেন, - Man is man and master of his fate."[৫]

জাতিগত কর্মের ফল গোটা জাতির উপর এর প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ জাতি তাদের পুণ্য সঞ্চয়ের ফলেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আবার সেই সাথে তারা ভারতবাসীর উপর জুলুম-অত্যাচার করে পাপ সঞ্চয়ও করছে।[৬]

বিভিন্ন ধর্মানুসারীগণ জন্মান্তরকৃত কর্মকে কখনো ভাগ্য আবার কখনো বা কিসমত হিসেবে মানেন। প্রাচীন গ্রীকগণ ভাগ্য-দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু বা অন্যান্য বড় ধর্মের ধর্মানুসারীগণও ভাগ্যকে স্বীকার করেন।[৭] অন্যদিকে বাস্তববাদী বা পৌরুষবাদীরা ভাগ্যকে বিশ্বাস করেন না বা মানেন না। তারা নিজ নিজ কর্মের গুণের উপরই কর্মফলের আশা করেন। অনেকক্ষেত্রে মহামানবগণ পৌরুষ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হ'ন। পুরাণে বর্ণিত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র পৌরুষ দ্বারা ইহ জীবনেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং বিশ্বামিত্র মুনি হিসেবে পরিচিতি পান। ধ্রুবও পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধ-নিরূপিত ভোগের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮]

---

[৫] ঐ, পৃষ্ঠা ৯২।
[৬] ঐ, পৃষ্ঠা ৬০-৬১।
[৭] ঐ, পৃষ্ঠা ৮০-৮১।
[৮] ঐ, পৃষ্ঠা ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা অমর ও অজেয়। আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত। আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। মৃত্যুর পর আত্মা জীব দেহ ছেড়ে লোকান্তরে অবস্থান করে পুনরায় ইহলোকে ফিরে এসে নতুন দেহ গ্রহণ করে। আর এ নতুন দেহ গ্রহণই হচ্ছে জন্মান্তর।[৯]

জন্মান্তরবাদের উল্লেখ উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে করা হয়েছে। পৃথিবীর অপরাপর ধর্মগ্রন্থেও জন্মান্তরের প্রসঙ্গ কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। পুনর্জন্মের কথা সর্বপ্রথম উপনিষদে পরিলক্ষিত হয়-বেদে শুধুমাত্র পরলোকে অমরত্বলাভ করার কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা আছে।

বেদে (রচনাকাল-আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্ব) পরলোকের কথা আছে, কিন্তু পুনর্জন্ম সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। বৌদ্ধধর্ম জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেছে, কিন্তু ইসলাম ধর্ম জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে না। খ্রীস্টান ধর্মও জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করেছে।[১০] তবে প্রাচীন খ্রীস্টান ধর্ম জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেছে বলে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

> "যিশুখৃষ্ট শিষ্যদিগের নিকট একাধিকবার ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন যে, ইহুদীদিগের পুর্ব্বযুগের ধর্ম্ম-শিক্ষক ইলায়াসই (Elias)জন রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।"[১১]

'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, হজরত মোহাম্মদ জন্মান্তরবাদকে সমর্থন করেছেন ঃ

---

[৯] ঐ, পৃষ্ঠা ৮।
[১০] খানবাহাদুর আহ্সানউল্লা, ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (ঢাকা ঃ জয় পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।
[১১] কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

"খোদা জীবসৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রেরণ করেন, যত দিন না তাহারা তাঁহার সমীপে ফিরিয়া যায়।"[১২]

সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যেও জন্মান্তর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশ আছে। জালালুদ্দিন রুমী তাঁর 'মেসনাভি' গ্রন্থে জীবের বিবর্তনকে সমর্থন জানিয়েছেন।[১৩] কিন্তু ইসলাম ধর্ম জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেনি। এ প্রসঙ্গে 'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"জন্মান্তর-বাদ মানিতে ইছলাম রাজী নহে। ইহাতে ধর্ম্ম বিশ্বাস দুর্ব্বল হয়। সৃষ্টি কর্ত্তার অনন্ত প্রেমের উপর নির্ভর জন্মে না।"[১৪]

গ্রীক মনীষী পিথাগোরস; প্লেটো, গ্যেটে সকলেই জন্মান্তরকে স্বীকার করেছেন।[১৫] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যাঙ্গেলিন পুণর্জন্মের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[১৬]

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বিবর্তন যদি জীবগত হয়, তবে জন্মান্তর স্বীকার করতে হয়। বিবর্তন আধুনিক বিজ্ঞানের একক কৃতিত্ব নয়। আর্য ঋষিগণও বিবর্তনের কথা বলেছেন।

"বিজ্ঞান বলেন, আদিতে শুধু 'প্রোটাইল' (Protyle) ছিল-আর ছিল Energy বা শক্তি। এই প্রোটাইল আমাদের পুরাণের কারণার্ণব, সাংখ্যের একাকার প্রকৃতি, ঋগ্বেদের অপ্রকেত সলিল।"[১৭]

---

[১২] ঐ, পৃষ্ঠা ১৫১।
[১৩] ঐ, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২।
[১৪] ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫।
[১৫] কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ১৩৮।
[১৬] ঐ, পৃষ্ঠা ২৭৯।
[১৭] ঐ, পৃষ্ঠা ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী সরীসৃপ হতে বিবর্তনের মধ্যদিয়ে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে। তদ্রূপ আর্য ঋষিগণের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারের ক্রমপর্যায় দ্বারা বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সত্যতা নিরূপিত হয়েছে।[১৮]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, (১৮৮৯-১৯৭৪) 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থের কোন কোন তথ্য থেকে মনে হতে পারে যে, তিনি পরোক্ষভাবে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

> "এই নশ্বর দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু ইহার ভিতরে যে সনাতন মানুষটী রহিয়াছে সে চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে। মহর্ষি মনসুর তদীয় মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে তাপসশ্রেষ্ঠ আত্তারের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"[১৯]

বৈচিত্রময় এ পৃথিবীতে মহামানব কর্তৃক মৃত ব্যক্তির প্রাণদানেরও অনেক ঘটনা ঘটেছে।[২০]

কর্মবাদ ও জন্মান্তর একে অপরের পরিপূরক। কর্মবাদকে স্বীকার করে নিলে জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করতে হয়। জীবের অধীষ্ঠাতা আত্মা অবিনাশী ও অবিনশ্বর। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই, উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। আত্মা পুরানো দেহ ছেড়ে নতুন দেহে পরিবর্তিত হয় মাত্র। জন্মান্তরবাদকে সমর্থন করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) 'যজ্ঞ-কথা' প্রবন্ধের আলোচনায় বলেছেনঃ

> "মৃত্যুর তৃতীয় দিনে খ্রীষ্ট সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন; লোকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সমাধি শূন্য; কোন কোন ভক্তকে তিনি এই

---

[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা, ১৭৮।
[১৯] মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, পারস্য-প্রতিভা, প্রথম খন্ড, (কলকাতা ঃ রায় এন্ড রায় চৌধুরী, ১৩৩০), পৃষ্ঠা ১৭১।
[২০] ঐ, পৃষ্ঠা ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

অবসরে সশরীরে দেখাও দিয়াছিলেন। তারপরে তিনি তিরোধান করেন - স্বর্গে আরোহণ করেন। এই ঘটনার নাম Resurrection বা পুনর্জন্মলাভ।"[২১]

তিন

অবতার

যিনি অব্যক্ত, নির্বিশেষ, নির্বিকার, লীলাবশে তিনিই ব্যক্ত হয়ে সবিশেষ সাকার রূপ ধারণ করেন, তাই অবতার।

জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে নিলে অবতারকেও স্বীকার করতে হয়। অবতারতত্ত্ব হিন্দু ধর্মের প্রধান কথা। অবতারদের ঘিরেই হিন্দু ধর্ম যুগযুগ ধরে উজ্জীবিত হয়েছে। অবতারদেরকে কেন্দ্র করেই হিন্দু সমাজের ধর্ম ও কর্মজীবন পরিচালিত হয়েছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে চব্বিশ জন অবতারের কথা জানা যায়। এঁদের মধ্যে পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণীই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। ঈশ্বরের অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা গীতায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

ঈশ্বর মানুষী তনুতে সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হ'ন না। কারণ, মানবের পক্ষে সমগ্র ঈশ্বরতেজ ধারণ করা অসম্ভব। তাই ঈশ্বরের ভগ্নাংশ শক্তি অবতারগণের আবেশে প্রবিষ্ট হয়।[২২] ঈশ্বরের অনাবৃত ঐশ্বর্য দর্শনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিশ্বরূপ সংবৃত করতে বলেন। অর্জুনের মতো শক্তিধর সাধক পুরুষও স্রষ্টার অনাবৃত ঐশ্বর্য দর্শনে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। সে জন্যই

---

[২১] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞ-কথা (কলকাতা ঃ সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ১৩২৭), পৃষ্ঠা ১২২।

[২২] হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, অবতার তত্ত্ব (কলকাতা ঃ দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩৩৫), পৃষ্ঠা ৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিধাতার সংবৃত ঐশ্বর্য কোন উন্নত পুরুষ বা মুক্ত পুরুষের শুদ্ধ আধারে আবিষ্ট হয়ে অবতাররূপে আবির্ভূত হ'ন। সাধারণ মানব ঈশ্বরের এরূপ ঐশ্বর্য বুঝতে না পেরে তাঁকে সাধারণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন।[২৩]

ঈশ্বর নিরাকার। নির্গুণ ঈশ্বর কখনো কখনো নিজ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সগুণ প্রাপ্ত হ'ন। বিধাতা তাঁর শক্তিকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত করেছেন। প্রকৃত অর্থে, শক্তির এই উৎস এক। কিন্তু এর প্রকাশ স্থান ভেদে একেক রকম।[২৪] শ্রীরামচন্দ্র বা যীশু খৃস্টে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের যতনা প্রকাশ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। অন্যদিকে খৃস্ট ধর্মের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, যিশু ও খৃস্ট ভিন্ন ব্যক্তি।

> "খৃষ্টীয় সমাজের যে 'নষ্টিক' (Gnostic) বিভাগ, সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব্বাপর বিশ্বাস করেন যে, যিশু ও খৃস্ট ভিন্ন ব্যক্তি-ভক্ত যিশুর দেহে ভগবান্ খৃষ্টের আবেশ হইয়াছিল।"[২৫]

শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে আত্ম-বিস্মৃতভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি বনবাসের সময় স্বর্ণমৃগের রূপে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া সীতাহরণের পর তাঁর উচ্চকণ্ঠে শোকাচ্ছ্বাসে এবং উন্মত্তবৎ প্রলাপে আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। অন্যদিকে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বাল্যকাল থেকে শুরু করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর লীলা মানুষের অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছে। তাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর বলেও ঘোষণা করেছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধ্যমে। মহাভারতের সভাপর্বে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জগৎ কর্তা বা পরমেশ্বর বলে অভিহিত করেছেন।

---

[২৩] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮।

[২৪] হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বেদান্ত পরিচয় (কলকাতা ঃ ফণিভূষণ দত্ত প্রকাশিত, ১৩৩১), পৃষ্ঠা ১৯।

[২৫] অবতার তত্ত্ব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব বিধাতা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বর। তাঁকে ঈশ্বরের ঈশ্বর অর্থাৎ মহেশ্বরও বলা হয়। আর এই মহেশ্বরই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

> "ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বরকে থিওসফিতে central বা Supreme Logos বলে। বৈষ্ণব পরিভাষায় ইনি কারণার্ণবশায়ী, গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণ।"[২৬]

শ্রীকৃষ্ণকে অবতার হিসেবে পুরাণ ও সংহিতাও ঘোষণা করেছে। খৃস্টের আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের বেসনগরে যে প্রাকৃত ভাষায় লেখা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়, সে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেই তা জানা গিয়েছে।[২৭] অপরদিকে গ্রীক দেবতা Heracles -এর সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের অনেক পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

> "ভাষ্যকার পতঞ্জলি উদ্ধৃত সূত্রে পাণিনির যে অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবতারবাদ বুদ্ধদেবের অপেক্ষাও প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা একেবারেই অসম্ভব নহে-কারণ, আমরা দেখিতে পাই গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতকে লিখিয়াছেন Heracles was worshipped in Methora and khisobara। এই Heracles খুব সম্ভব শ্রীকৃষ্ণ অথবা বলরাম।"[২৮]

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যীশু খৃস্টও সময় সময় নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র অভিন্ন। এই স্রষ্টার পুত্রই হচ্ছেন ঈশ্বরের অবতার।

---

[২৬] ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৩।
[২৭] ঐ, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১।
[২৮] ঐ, পৃষ্ঠা ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

"খ্রীষ্ট নিজ মুখে বলেন, আমি আর আমার পিতা অভিন্ন; - I and my Father are one - তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনিই তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া গেল।"[২৯]

ভারতবর্ষে অবতারবাদের অস্তিত্ব প্রাচীন কালের হিন্দুর মৌলিক চিন্তারই ফসল। এদেশের অবতারতত্ত্ববাদ অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা নয়।[৩০] শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খৃস্ট ঈশ্বরের অবতার বা পুত্র। তাঁরা ছিলেন অতিমানব। কিন্তু নিরাকার ও একেশ্বরবাদের পূজারী হজরত মোহাম্মদ তাঁদের মতো অতিমানব ছিলেন না। তিনি সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে সাধনার মধ্যদিয়ে আল্লার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) 'মানব-মুকুট' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"হজরত মোহাম্মদ মানবতার সুমহান গৌরব। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহেন, তিনি মানুষ; ইহাতেই তাঁহার সার্থকতা ও ইহাতেই তাঁহার অহঙ্কার।"[৩১]

জগৎ সংসারে জীবন-সমস্যার সমাধান করে ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠার মধ্যেই রয়েছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম ও সুমহান লক্ষ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে হজরত মোহাম্মদ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। মানবিক গুণে গুণান্বিত উভয়েই ছিলেন গৃহী। তাঁরা জাতীয় জীবনে কাজ করার পাশাপাশি মানুষকে ধর্ম সাধনেরও উপদেশ দিয়েছেন।[৩২]

হজরত মোহাম্মদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির প্রাবল্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর মনের ভেতরে মানবিক আচরণের কমতি ছিল না। সাধারণ মানুষের মতো আচার-আচরণ ও জীবন যাত্রা নির্বাহ করেছেন তিনি।

---

[২৯] যজ্ঞ-কথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫।
[৩০] অবতার তত্ত্ব, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৭।
[৩১] এয়াকুব আলী চৌধুরী, মানব-মুকুট (কলকাতা ঃ নওরোজ লাইব্রেরী, ১৯৫৩), পৃষ্ঠা ৭।
[৩২] ঐ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যের লেখকগণ হজরত মোহাম্মদকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে অভিহিত করেছেন। তারা যীশু খৃস্টকে হজরত মোহাম্মদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সেইসাথে মোহাম্মদকে যীশুর প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও তারা মনে করেছেন।[৩৩] এভাবে পাশ্চাত্যের লেখকগণ বিভিন্ন সময়ে আরবদেশীয় মুসলমানের মধ্যে হজরত মোহাম্মদকে ঈশ্বরের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিল। ফিলিস্তিনের মুসলমান মহিলাগণও হজরতকে ঈশ্বর হিসেবে অভিহিত করে প্রার্থনা করতেন।[৩৪]

হজরত মোহাম্মদকে যারা ঈশ্বরের অবতার হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তারা পবিত্র কোরাণ শরীফের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। পবিত্র কোরাণ শরীফে হজরতকে সাধারণ মানব হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> "(মোহাম্মদ!) তুমি সকলকে বলিয়া দাও যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগের ন্যায় একজন মানববই আর কিছুই নহি।"[৩৫]

হিন্দুদের পাশাপাশি খ্রীস্টানগণও যীশুকে অতিমানব হিসেবে তুলে ধরতে যেয়ে তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন। হজরত মোহাম্মদ তাঁর সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা যেন কখনো যীশুর মতো তাঁকে ঈশ্বরের আসনে না বসান।[৩৬]

---

[৩৩] মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (ঢাকা ঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮।
[৩৪] ঐ, পৃষ্ঠা ১২৮।
[৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা ২৬১।
[৩৬] ঐ, পৃষ্ঠা ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

অতি উৎসাহী ভক্তদের অতিরঞ্জিত কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ বা যীশুকে অতিমানব হিসেবে চিহ্নিত করে সাধারণ মানুষের জ্ঞান, কর্ম, ধর্ম ও মনুষ্যত্বের চরম ক্ষতি সাধন করেছে বলে মোহাম্মদ আকরম খাঁ মনে করেছেন।[৩৭] ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি ইহুদী ধর্মও জন্মান্তরবাদ তথা ঈশ্বরের দেহ ধারণ করাকে বিশ্বাস করেন না।

> "ঈশ্বর যে নরদেহ ধারণ করিতে পারেন, কোন জীব যে ঈশ্বর হইতে পারেন, ইহুদীর পক্ষে ইহা কল্পনাতীত।"[৩৮]

চার

শক্তি সাধনা, সাম্য ও স্বাধীনতা

শক্তি সাধনার প্রধান বীজ হচ্ছে আত্মচেষ্টা এবং আত্মনির্ভরতা। বাঙালীর ভেতরে এ দু'টোর অভাব রয়েছে। ফলে বাঙালী যুগযুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে। বাঙালী হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মহাশক্তির আরাধনা করেন। দুর্গা হচ্ছেন এই মহাশক্তির আধার।

দুর্গোৎসব বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসব। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে সিলেট জেলার তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ণ প্রথম বাংলাদেশে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সেই থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশে দুর্গোৎসবের মাধ্যমে মহাশক্তির আরাধনা চলে আসছে।

---

[৩৭] ঐ, (উপক্রমনিকা এর প্রাথমিক কথা), পৃষ্ঠা ৪।

[৩৮] যজ্ঞ-কথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের মানুষ বিপর্যস্ত। এর ভেতরেও মানুষ হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মহাশক্তি দুর্গার পূজা করে আসছে। মানুষ আশা করে যে, দেবী হয়তো তাদের উপর প্রসন্ন হবেন। তাদের অভাব ঘুচবে, সেইসাথে ঘুচবে পরাধীনতা। কিন্তু মানুষের আশার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তবুও মানুষ হতোদ্যম না হয়ে মহাশক্তির উদ্বোধনের ভেতর দিয়ে তাদের হৃত মাতৃভূমির পুনরুদ্ধার চায়।[৩৯]

মহাশক্তির মহোৎসবকে কেন্দ্র করে মহামিলনের যে মেলা বসেছিল, দেবীর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মহামিলনের সে মেলা ভেঙ্গে যায়, এবং সেই সাথে মুক্তির একতাও বিনষ্ট হয়ে যায়।[৪০]

যুগ যুগ ধরে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে বাঙালীর স্বাধীন চিন্তা-শক্তিও লোপ পেয়েছে। তারা বিদেশী শাসক শ্রেণীর অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলছে। ফলে বাঙালী তার নিজস্ব স্বকীয়তা তথা কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দিন দিন হারিয়ে ফেলছে। নিজেরা নিজেদের ভালো না চাইলে ঈশ্বর কখনো তাদেরকে সাহায্য করেন না।[৪১]

যে দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে শক্তি সঞ্চার হয়, সেই শক্তিকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য পাশ্চাত্যভাবাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় দুর্গোৎসবকে বর্জন করতে সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা এই লাঞ্ছনার যন্ত্রনাকে ভুলে নতুন করে শক্তির আরাধনায় নিজেদেরকে উৎসর্গীকৃত করেছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) মতে ঃ ঐ / ৭ /

---

৩৯ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মহাপূজা (কলকাতা ঃ বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ১৩২৮), পৃষ্ঠা ১৮।

৪০ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬।

৪১ ঐ, পৃষ্ঠা ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"বাঙ্গালা নিশীথ অন্ধকারের অন্ধনিবাস। এই অন্ধকারে চপলাচমক দেখিলে হৃদয় আশ্বাসিত হয়। বঙ্গের দুর্গোৎসব সেই চপলা-চমক, দুর্গোৎসবে বঙ্গবাসীর মন আশ্বাসিত হয়।"[৪২]

মানুষের ভেতরের অপরিমেয় শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোন বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করেই এই শক্তির উন্মেষ ঘটে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভেতর দিয়ে মানুষে-মানুষে শক্তির সম্মিলন ঘটে। শক্তির এই সম্মিলন ঘটলেই মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়।[৪৩] মানুষের ভেতরের এই অপরিমেয় শক্তিকে মানব কল্যাণে ব্যয়িত করাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের কাজ। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ এই শক্তিকে মানবজাতির অকল্যাণে ব্যয়িত করছে। একদিন এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় সম্রাটগণ রাজ্য শাসন করেছেন। তারপর এক সময় এই শক্তির অবসানও ঘটেছে। কিন্তু এতে পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যতদিন মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার জন্ম না হবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দুঃখের ভেতর দিয়েই মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠে।

"মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ত্ব, সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পূণ্যের মূল্য দুঃখে।"[৪৪]

শ্রীকৃষ্ণের বাণী মানুষকে জাতিভেদ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে এনে সকলকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছে। সমগ্র জাতিকে একসূত্রে আবদ্ধতার মধ্যেই রয়েছে জাতীয় ঐক্য। আর এই জাতীয় ঐক্যই হচ্ছে সাম্যবাদের মূল সুর। স্বদেশ প্রেম ও সাম্যবাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ভেতরেই গ্রথিত আছে। বিদেশী শাসক শ্রেণী মানুষকে যে সাম্যবাদের কথা শুনায়, প্রকৃত পক্ষে

---

৪২ ঐ, পৃষ্ঠা ২।

৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন ঃ উৎসবের দিন (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী, ১৩৮৬), পৃষ্ঠা ১৯০।

৪৪ সংকলন ঃ দুঃখ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্যবাদের গভীরতা তার ভেতরে নেই। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) 'পাল-পার্ব্বণ' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> "আজকাল যে ইংরেজ প্রদত্ত অধিকার বা বিলাতি সাম্যবাদের বলে একতার আন্দোলন চলিতেছে উহার গভীরতা অতি অল্প।"[৪৫]

হিন্দুধর্মে বার মাসে তের পার্বণের কথা প্রচলিত আছে। ধর্মকে কেন্দ্র করেই পার্বণ গুলোর উৎপত্তি। আর পার্বণ গুলোর মধ্যে রয়েছে গভীর তাৎপর্য। এসব পাল-পার্বণের ভেতর দিয়ে জাতি নতুন-নতুন শক্তি ও আশায় উদ্ভাসিত হয়ে বিদেশী শক্তির দখল থেকে মাতৃভূমির উদ্ধারে সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি তারা বিদেশী পণ্য পরিহার করে স্বাদেশিকতার মন্ত্রেও উজ্জীবিত হয়েছে।[৪৬] তাই দেশের তথা সমাজের আপামর জনতার সম্মিলিত প্রয়াসই পারে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেশের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করতে।

পাঁচ

জ্ঞান ও যাগ-যজ্ঞ

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিদ্যা শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশ ও জাতির উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। অতীতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদশিক্ষা করতে হতো। বেদ শিক্ষা শেষ না করা পর্যন্ত কেউ সংসার জীবন ও ধর্ম জীবনের কোন কাজে অংশ নিতে পারতেন না। দ্বিজ-সমাজে মূর্খের কোনরূপ স্থান ছিল না। প্রত্যেক

---

৪৫ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাল-পার্ব্বণ (চন্দন নগর ঃ প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউজ, ১৩৩১), পৃষ্ঠা ৬।

৪৬ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিজের পক্ষে বিদ্যালাভ আবশ্যক ছিল।[৪৭] বর্তমান সমাজের ন্যায় প্রাচীন সমাজেও বিদ্যাশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

জ্ঞান আহরণ ছাড়া যেমন আত্মিক মুক্তি ঘটে না, তদ্রূপ ব্যক্তি, জাতি তথা দেশেরও মঙ্গল সাধিত হয় না। জ্ঞান আহরণের জন্য চীনদেশ পর্যন্ত যাবার জন্য হজরত মোহাম্মদ তাঁর সাহাবাদের প্রতি আদেশ করেছিলেন। সেহেতু জ্ঞানার্জন ব্যতিরেক ব্যক্তি তথা জাতির উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৮৭৪-১৯৬৫) এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

> "যাহাদের জ্ঞানের জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হাদিছ রাখিয়া গিয়াছ, যাহাদের পরিচালনের জন্য আপন ছেল্‌ছেলা (পুরুষ পরম্পরা) সুস্থির রাখিয়াছ, আজ তাহারা ক্রমে বিস্মৃতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আজ তাহারা সেই অমূল্য উপদেশাবলী বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় পূর্ণ দুনিয়াদার সাজিয়াছে, আজ তাহারা ইছলামের অলৌকিকত্ব ভুলিয়া স্বীয় জাতির পূর্ব্বগৌরব পদদলিত করিয়া ক্রমে গভীর অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা আজ মানব সমাজে হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহারা আজ অজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিত, তাহারা আজ কর্মক্ষেত্রে নিষ্কর্মা বলিয়া পরিগণিত।"[৪৮]

মানুষের অন্তরে স্রষ্টা অফুরন্ত জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ এই জ্ঞান রাজ্যের ভেতর দিয়ে নিজেই নিজের স্বর্গ গড়ে তোলতে পারেন, আবার অজ্ঞানতার পঙ্কে আবদ্ধ হয়ে নরকেরও সৃষ্টি করতে পারেন। স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি মানুষই তার কৃতকর্মের ভেতর দিয়ে তৈরী করে নেয়।

---

৪৭ যজ্ঞ কথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬-৭।

৪৮ ইছলাম ও আদর্শ-মহাপুরুষ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা (উপক্রমণিকা) ৭।

Dhaka University Institutional Repository

"প্রকৃত পক্ষে মানব হৃদয়েই স্বর্গ নরক উভয়ের সমাবেশ। এই পৃথিবীতেই মানব স্বর্গীয় সুখের আভাষ পাইতে পারে; আবার এই পৃথিবীতেই সে নরকের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে।"[৪৯]

আর্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বেদপন্থী সমাজ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল যজ্ঞ। তাঁরা একসময় শীত প্রধান দেশের অধিবাসী ছিলেন; সেইজন্য তাঁদের কাছে অগ্নির মাহাত্ম্য ছিল অপরিসীম। বেদপন্থী সমাজ দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য নানা রকম যাগ যজ্ঞের প্রবর্তন করেন। তাঁদের ধারণা ছিল, দেবতারা সূক্ষ্ম শরীরী বিধায় স্থূল অন্ন গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য কোন দ্রব্য আগুনে ফেললে তা ধূয়ায়, বাষ্পে, বায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপে সূক্ষ্মতা পেলে তা দেবতাদের সূক্ষ্মদেহের উপযোগী হয়।[৫০]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'যজ্ঞ-কথা' গ্রন্থে যজ্ঞের পাঁচটি ভাগ দেখিয়েছেন ঃ অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র; ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ; সোম-যাগ; খ্রীস্ট-যাগ এবং পুরুষ-যজ্ঞ।

সাধারণ অর্থে দেবতার উদ্দেশ্যে কোনও দ্রব্য ত্যাগের নাম হচ্ছে যজ্ঞ।[৫১] কিন্তু ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর হলো যজ্ঞ। এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ-স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করে যজ্ঞ করতে হয়।[৫২]

যজ্ঞকে মানব সমাজ বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কারো নিকট দ্রব্য ত্যাগই যজ্ঞ, কারো বা তপস্যা যজ্ঞ, কারো যোগ যজ্ঞ,

---

৪৯ ঐ, পৃষ্ঠা ৮।

৫০ যজ্ঞ-কথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫-২৬।

৫১ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬।

৫২ ঐ, পৃষ্ঠা ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

বেদাধ্যায়ন ও জ্ঞানার্জনই কারো নিকট যজ্ঞ। ফলে কর্ম মাত্রই যজ্ঞ। এবং ত্যাগাত্মক কর্মই হচ্ছে যজ্ঞের মূল কথা।[৫৩]

প্রাচীন ঋষিগণ নিজ নিজ আত্মোন্নতির পাশাপাশি জগতের সকল প্রাণির উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের নিমিত্তে যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন করতেন। তাঁদের চিন্তায় যখন উদ্ভাসিত হলো যে, স্বয়ং স্রষ্টা এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞে সদাই ক্রিয়মান রয়েছেন। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞ কর্মের অঙ্গ স্বরূপ। এই যজ্ঞের প্রায়ণও নেই, উদয়নও নেই, আরম্ভও নেই এবং সমাপ্তিও নেই।[৫৪] মানবের সামাজিক জীবন, গার্হস্থ্য জীবন, লোকস্থিতি ও লোকযাত্রা এখন পর্যন্ত যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ব্যাপারটি হচ্ছে একটা প্রতীক। সমাজে মানবকে কোন পথে চলতে হবে, কোন উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলতে হবে, তারই প্রতীক।[৫৫]

মানব জীবনের সার্থকতা হচ্ছে প্রত্যেক প্রাণিকে নিজের মতো করে দেখায়। প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্মকে বৃহৎ করে দেখার পাশাপাশি মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। আর তা না হলে পশুর সঙ্গে মানব জীবনের কোন পার্থক্য থাকে না।[৫৬] জীবনের কর্ম মাত্রই যখন যজ্ঞ, তখন সমগ্র প্রাণির মঙ্গল কামনায় মানব সমাজের নিত্য যজ্ঞ সম্পাদন করা প্রয়োজন। আত্মতুষ্টির পাশাপাশি অপরের তৃপ্তি সাধন করাও মানবের কর্তব্য। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে ঃ

> "ভাতের যে প্রথম গ্রাস উপস্থিত হয়, তাহা হোম দ্রব্য; প্রাণায় স্বাহা বলিয়া সেই ভাতের গ্রাস আহুতি দিবে, প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইবে। কেবল নিজের প্রাণ কেন, বিশ্বের প্রাণ ইহাতে তৃপ্ত হইবে; এইরূপে যে

---

৫৩ ঐ, পৃষ্ঠা ১৭০।
৫৪ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৩।
৫৫ ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৪।
৫৬ ঐ, পৃষ্ঠা ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

আহুতি দেওয়া যায়, তাহা সর্ব্ব লোকে, সর্ব্ব ভূতে, সর্ব্ব আত্মায় আহুতিরূপে অর্পিত হয়।"[৫৭]

এ মহাবিশ্বে ঈশ্বরও কখনো কখনো অবতার রূপে দেহ ধারণ করে জীবকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দেন। ঈশ্বরের এই আত্মোৎসর্গই হচ্ছে একটা যজ্ঞ। মহাত্মা যীশু খৃস্ট নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন জীব শিক্ষার নিমিত্ত। তাঁর আত্মোৎসর্গের ভেতর দিয়ে তিনি এই ধরাধামে এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করে গেছেন। 'যজ্ঞ-কথা' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন -

"খ্রীষ্টের ক্রসে আরোহণটাই যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গ, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ, কেননা ঈশ্বরের জীবত্ব-গ্রহণই আত্মোৎসর্গের ব্যাপার।"[৫৮]

কর্মযোগ; জন্মান্তরবাদ; অবতারবাদ; শক্তিসাধনা, সাম্য ও স্বাধীনতা; জ্ঞান ও যাগ-যজ্ঞের ভেতরে কর্মবাদকে সর্বাজ্ঞে স্থান দেয়ার পাশাপাশি জন্মান্তর ও অবতারবাদকে স্বীকার করা হয়েছে। আবার কোন কোন ধর্ম এ সবকে অস্বীকার করেছে। তাছাড়া জন্মান্তরবাদ যে বিজ্ঞানবিরোধী নয়, তা প্রমাণ করার সাথে সাথে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মও জন্মান্তরকে স্বীকার করে নিয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কর্মবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত কর্মফল কিভাবে জাতিগত কর্মফলে পর্যবসিত হয়ে সমগ্র জাতির জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে তাও এতে বিধৃত আছে।

শক্তিসাধনা, সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে বাঙালীর শক্তি সঞ্চয় করার মধ্যদিয়ে বিদেশী শক্তির কবল থেকে জন্মভূমিকে উদ্ধার এবং সমাজে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠার কথা এতে রয়েছে। তাছাড়া জ্ঞান ও যাগ-যজ্ঞের ভেতরে

---

[৫৭] ঐ, পৃষ্ঠা ১৭৫।

[৫৮] ঐ, পৃষ্ঠা ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি প্রাচীন যাগ-যজ্ঞের উৎপত্তি এবং বর্তমান সমাজে এর কার্যকারিতার দিকটিও প্রাধান্য পেয়েছে। এ মহাবিশ্বে ঈশ্বর অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়ে কীভাবে নিজ দেহকে জীবের কল্যাণার্থে উৎসর্গ করে যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেছেন তাও এসকল গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

ছয়

আলোচ্য গ্রন্থগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লেখকেরাই ধর্ম নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে গৌরব বোধ করেছেন এবং বর্তমান যুগেও যে তার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। স্বধর্মীর প্রতি ও স্বধর্মের প্রতি প্রবল প্রেম এই বইগুলি রচনার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল তা বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের উদ্ভব বহুকাল পূর্বে হলেও যে, আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তার বিরোধ নেই, তা লেখকেরা দেখাতে চেয়েছেন। অবতারতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি যে বিজ্ঞানসম্মত ও ইতিহাসসম্মত তা তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম বিজ্ঞান-বিরোধী নয়, সেই প্রত্যয়-তাঁদের মনে সক্রিয় ছিল। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বা কোরান হাদিস পাঠ ও অধ্যয়ন করলে বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারের ইংগিত পাওয়া যেতে পারে তাতে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন।

তৃতীয়ত, বইগুলি রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরেজ ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা লিখেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"ইছলাম রাজভক্তি শিক্ষা দেয়, (রাজা মোছলেম হোক আর অমোছলেম হোক) এই বিবেচনা করিয়া আমাদের রাজভক্ত হওয়া উচিত যে, খোদাতায়ালা তাঁহার অসীম জ্ঞান বলে তাঁহারই হস্তে আমাদিগকে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা, সম্মান, সম্ভ্রম, জীবন, সম্পত্তি সবই তাঁহারই আয়ত্বাধীন। অতএব কোন পুরস্কারের আশা না রাখিয়া আমাদের রাজভক্তি প্রদর্শন করা উচিত।"[৫৯]

হীরেন্দ্রনাথ দত্তও ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকারের মধ্যে-ধর্মের লীলা অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজ্যবিস্তার করে, সে সম্বন্ধে বৃটিশ রাজপুরুষদিগের এবং বৃটিশ জাতির আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অথচ বিধাতা ঘটনাচক্র এমন ঘূর্ণিত করিলেন যে, অনেকটা বাধ্য হইয়াই ইংলন্ডকে ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইল।"[৬০]

তিনি আরো লিখেছেন -

"ইংরেজ-জাতি বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিগ্রো-জাতির দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়া যে পুণ্যপুঞ্জ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষাৎ পুরস্কার এই ভারত সাম্রাজ্য।"[৬১]

চতুর্থত, দুই ধর্মের লেখকেরাই নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছেন। কোন-কোন অংশে দুই ধর্মের সমন্বয়ের মনোভাব থাকলেও নিজেদের ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে দুই শ্রেণীর লেখকেরাই যত্নবান ছিলেন। তবে মুসলমান লেখকেরা প্রধানত লিখেছেন হজরত মোহাম্মদের জীবনী সম্পর্কে। 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থেও ইসলাম যুগের ইরানের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম আলোচিত হয়েছে। কোরান-হাদিসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস কম দেখা যায়।

---

[৫৯] ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১।

[৬০] কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০।

[৬১] ঐ, পৃষ্ঠা ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য

১৯২০-১৯৩০ দশকটি সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকে প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা (১৩৩৫)
২. কাজী আবদুল ওদুদ, নবপর্যায়, প্রথম খন্ড (১৩৩৩); দ্বিতীয় খন্ড (১৩৩৬)
৩. চিত্তরঞ্জন দাশ, কাব্যের কথা (১৯২০)
৪. নলিনীকান্ত গুপ্ত, সাহিত্যিকা (১৯২০); রূপ ও রস (১৯২৮)
৫. প্রমথ চৌধুরী, আমাদের শিক্ষা (১৩২৭)
৬. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা (১৩২৮)
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন (১৩৩২)
৮. শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন (১৯২২); বাণী-মন্দির (১৯২৮)
৯. এস. ওয়াজেদ আলি, মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য (১৩৩২)

বইগুলিতে সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি মৌল বিষয় আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। সাহিত্যরচনার কৌশল, সাহিত্যের রসনিষ্পত্তি, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক, লেখকের অন্তর্জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক, সমাজ জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা, কাব্যরচনার উপাদান, সাহিত্যের সমস্যা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নানা প্রসঙ্গে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন (মৃত্যু ১৯৩৭) এর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রসিদ্ধ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অনুরোধে রচিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের কয়েকটি নামকরা উপন্যাস ব্যাখ্যা করে সেগুলি সমাজে কল্যাণ না অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সধবা ও বিধবা নারীর প্রেম অংকন করে তাঁরা হিন্দু সমাজবিগর্হিত কাজ করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ঃ

> "সৎ সাহিত্য আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের মন সুস্থ রাখে। আবার তেমনি অসৎ সাহিত্য একটা দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপাদন করে।"[১]

লেখকের আরো একটি প্রধান আপত্তির কারণ যে, উপন্যাস পাঠকের বড় অংশ অন্তঃপুরের মেয়েরা। তাঁর ভাষায়-

> " অধিকাংশ নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার (Unhealthy atmosphere এর) সৃষ্টি করিতেছে- আমাদের সমাজের বায়ু দূষিত করিতেছে, ইহাই আমাদের প্রধান আপত্তির কারণ।"[২]

প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক সাহিত্য মানুষের মনকে মহৎ চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী কাজে উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে বিধবার

---

১ যতীন্দ্রমোহন সিংহ, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা (কলকাতা ঃ ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্, ১৩২৮), পৃষ্ঠা ৩।

২ ঐ, পৃষ্ঠা ১১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের যে স্ফুরণ ঘটিয়েছেন, শরৎচন্দ্র তাতে পূর্ণাহুতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে দেবর-বৌদির সঙ্গে প্রেম ঘটিয়ে পবিত্র স্নেহের অপব্যবহার ঘটিয়ে সমাজে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্র কিরণময়ী চরিত্রের মধ্যদিয়ে বারনারীর প্রেমের প্রসারতা ঘটিয়েছেন।[৩]

প্রাচীন সাহিত্যে বিয়ের পূর্বের প্রেম ও বিধবাদের প্রেমকে স্বীকার করা হয়নি। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রেম এবং বিধবাদের বিয়েকে সেকালের সাহিত্য স্বীকৃতি দিয়েছে। রামায়ণে বালির স্ত্রী তারা বা রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর সঙ্গে তৎকালে প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুনর্বার দেবরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করে এর পথ দেখিয়েছেন।[৪] বিধবাদের প্রেম হিন্দু সমাজের আদর্শ অনুসারে ঘোরতর পাপের কাজ বলে তৎকালীন সমাজে পরিগণিত হতো। সে সমাজ বিধবাদের দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক কালে তাদেরকে সে স্থান থেকে টেনে নামিয়ে সমাজের যথেষ্ট অপকার করা হয়েছে।[৫]

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যে আর্টকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাঁদের সে আর্ট বাঙালী সমাজে নিষ্ফল হয়েছে। তাঁরা সমাজে পাপচিত্র বাড়িয়ে সমাজের আবহাওয়া দূষিত ও মানুষের মনকে রোগগ্রস্থ করে তুলেছেন।[৬] পাশ্চাত্যের অনেক লেখক তাঁদের সমাজকে সুস্থ ও সুন্দর করে তোলার জন্য সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যদিও তাঁরা আর্টের চর্চা করেছেন, কিন্তু তারা আর্টের অধীন ছিলেন না। সে জন্যই তাঁরা মানুষকে সুশিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

---

৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৯৯।
৪ ঐ, পৃষ্ঠা ১৫।
৫ ঐ, পৃষ্ঠা ৩০।
৬ ঐ, পৃষ্ঠা ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আর্ট কেবল সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করে না, তা মানব হৃদয়ের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে-চিত্ত শুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান কালের সাহিত্যিকগণ এই আর্টকে কাজে লাগিয়ে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন। লেখক সমাজের এহেন পরিস্থিতিতে সাহিত্যিকগণকে সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে মানুষের মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ঘটাতে বলেছেন।

> "বাঙালী জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবেন, সেই সঙ্গে বাঙালীকে মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইবেন।"[৭]

বাঙালী সমাজ জীবনে প্রেম বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। পরকীয়া প্রেম কাব্য-সাহিত্যের দিক দিয়ে যদিও উৎকৃষ্ট উপাদান; কিন্তু সমাজ জীবনে এর প্রভাব ক্ষতিকর। সমাজ জীবনে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পরকীয় প্রেমাসক্তা সৌদামিনীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু দেব-চরিত্র ঘনশ্যামের সংখ্যা বেশী বাড়ছে না।[৮] যতীন্দ্রমোহন সিংহের সেই মতবাদ নিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮) 'বাণী-মন্দির' গ্রন্থেও অনেকটা অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। একালের সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে ব্যভিচার ও যৌনবৃত্তির স্নায়বিক উত্তেজনায় মেতে উঠেছে বলে তিনি বলেছেন।

> "Art for Art's sake আদর্শে ব্যভিচারাত্মক প্রেম ও আধুনিক কথা সাহিত্যের রসতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'চেখের বালি' ও 'ঘরে বাহিরে' গল্পও ব্যভিচারাত্মক কামকেই প্রাধান্যতঃ আশ্রয় করিয়া আর্টের 'সৌন্দর্য্য' চয়ন ও রসসিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"[৯]

---

৭ ঐ, পৃষ্ঠা ১১৯।

৮ ঐ, পৃষ্ঠা ৬৮।

৯ শশাঙ্কমোহন সেন, বাণী-মন্দির (কলকাতা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৮), পৃষ্ঠা ৫৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি কু-সাহিত্য, সৎ-সাহিত্য ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। সৎ-সাহিত্যিকদের কু-সাহিত্যের আদর্শের বিরুদ্ধে 'অগ্রণী ভূমিকা' নিতে তিনি আবেদন করেছিলেন।[১০]

তিন

জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে অনেক লেখক সেই সময়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। শশাঙ্কমোহন সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ও নলিনীকান্ত গুপ্তের (জন্ম ১৮৯০) লেখায় এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠলেই তার মধ্যে স্বদেশের অন্তরাত্মার ছবি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সাহিত্যিককে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হয়।

> "কাব্যে কবির অন্তরাত্মার ছবি সরলভাবে প্রতিফলিত হওয়া, সাহিত্য মাত্রেই জাতীয়-অন্তরাত্মার ছায়াবহ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।"[১১]

এই মনোভাব চিত্তরঞ্জন দাশ ও নলিনীকান্ত গুপ্ত মেনে নিয়েছেন। 'কাব্যের কথা' গ্রন্থে চিত্তরঞ্জন দাশ মূলত মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা তথা বৈষ্ণব পদ ও শাক্তপদ নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, বাঙালীর ঐতিহ্য ও জীবনধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই সেগুলি সাহিত্য হিসেবে সফলতা অর্জন করেছে। তাঁর মতে, বৈষ্ণব সাহিত্যের ভেতরেই নিজের পরিচয়ের পাশাপাশি দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিদের সাধনা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর সাধনা। তাঁদের প্রত্যেক অনুভূতি তাঁদের হৃদয় ও প্রাণের অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আত্মার সেই প্রেম রসের অনন্ত বিভূতি পরাধীনতার ভেতর থেকেই

---

[১০] ঐ, পৃষ্ঠা ৫৯০।

[১১] শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন, অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা ঃ এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৯৫৯), পৃষ্ঠা ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা অর্জন করেছিলেন।[১২] বৈষ্ণব পদাবলীর সুরের ভেতর দিয়েই বাংলার অন্তরাত্মার প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালী কবিদের লক্ষ্য করে আরেকজন সমালোচক বলেছেন-

> "হে বাংলার কবি, এই সুরকে ভুলিও না, এইখানেই তোমার অন্তরাত্মা, বাংলার প্রাণ হইতেছে বৈষ্ণবের প্রাণ, তাহার সাহিত্যের মৌলিক সুর পদাবলীর সুর।"[১৩]

চন্ডিদাস, বিদ্যাপতি ও শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫/৮৬-১৫৩৩) বাংলার পরিপূর্ণ রস মূর্তিটিকে নিজেদের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। রামপ্রসাদের (১৭২০/৩০-১৭৮২) গান, নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্তের (১৭৪১-১৮৩৯) টপ্পা, রামবসুর (১৭৮৬-১৮২৮) গানের ভেতর দিয়ে বাংলার ঘরের প্রাণের কথাই ফুটে উঠেছে। আধুনিককালে মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটেছে। সাহিত্যের প্রধান কাজই জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা। মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার সাহিত্যের উপর ন্যস্ত। সাহিত্যচর্চা জাতীয় জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এর মধ্যদিয়ে যা কিছু গড়ে উঠে, তার মূলে থাকে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব। শশাঙ্কমোহন সেনের মতে ঃ

> "সাহিত্য জতিগঠনের এবং জাতীয় জীবনেরও প্রধান অবলম্বন; জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, রক্ষণ, ধারণ এবং পরিশোষণের মূল শক্তি সাহিত্যের হস্তেই আছে।" [১৪]

চন্ডিদাসের কাব্যের ভাব সার্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কাব্যের ভেতর দিয়ে সকল মানবকে একই সূত্রে গাঁথতে প্রয়াস পেয়েছেন।

---

১২ চিত্তরঞ্জন দাশ, কাব্যের কথা (কলকাতা ঃ ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৯২০), পৃষ্ঠা ৭৯।

১৩ সাহিত্যিকা, নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খন্ড (কলকাতা ঃ শৃণ্বন্তু, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ১৫।

১৪ বাণী-মন্দির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০০।

Dhaka University Institutional Repository

চন্ডিদাসের অসমাপ্ত কাজ শ্রীচৈতন্য সমাপ্ত করেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা গানে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়ে তাকে আরো সার্বজনীন করে জীবন ও কর্মে মুখরিত করে তোলে। এতে মানব সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। বৈষ্ণব কবিদের সে সকল গানের সুধার ধারায় বাংলাদেশ ভেসে যায়। এরপর রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের গানে বাংলার পল্লী মুখরিত হয়ে উঠে। বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর, বিচিত্র পদাবলী, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণে বাংলায় আবার নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়। এসবের পূর্বে বিদেশী শাসন-শোষণে বাংলার বৈষ্ণবীয় সাহিত্য জগৎ কিছুদিনের জন্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন ঃ

> "বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল।"[১৫]

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ন্যায় 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের ভেতরেও বাঙালীত্বের প্রভাব রয়েছে, এবং সেই সাথে বাংলার বৈষ্ণবীয় প্রকৃতির প্রভাবও তার ভেতরে বিদ্যমান আছে। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যেও স্বদেশপ্রীতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে।

চার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংকলন'-এ সাহিত্য বিষয়ে চারটি প্রবন্ধ রচনা রয়েছে ঃ 'মেঘদূত'; 'শকুন্তলা'; 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' ও 'রাজসিংহ'। প্রবন্ধ সমূহে রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের মূল প্রবণতা অনেকটা ধরা পড়েছে। তিনি আনন্দের ও সৌন্দর্যের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন; সাহিত্য মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ে যায় বলেও তাঁর ধারণা ছিল। সেই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি 'শকুন্তলা'; 'মেঘদূত'; 'রাজসিংহ' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' সহ চারটি প্রবন্ধই নতুন আলোকে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে।

---

[১৫] কাব্যের কথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির, তরুলতা, পশুপাখীর একটা সহজ আত্মীয়তাবোধ, হৃদয়ের একটা গভীর সম্পর্ক অতি সহজেই স্থাপিত হয়েছে বলে তিনি লক্ষ্য করেছেন। আপন পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মিলনেই মানবের প্রিয় মিলনের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়েছে।

অনন্তের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে পরিদৃশ্যমান জগৎ এর অন্তরায় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "আমরা যেন কোনো-এক কালে একত্র মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।"[১৬]

বিশ্বপ্রকৃতির প্রশান্ত ও সুন্দর মূর্তি 'শকুন্তলা' নাটকে দৃশ্যমান, এতে কালিদাস শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও ক্ষুণ্ন করেননি। শেক্স্‌পীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের মতো কালিদাস সম্ভোগের রাশকে আলগা না করে তাকে সংযত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।[১৭]

প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন স্মৃতির ক্ষুদ্রাংশ ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু এতে এর রসাস্বাদের কোন কমতি হয়না। উৎকর্ষের বিচারে যদিও এর গুরুত্ব কম; কিন্তু শিশুর মনোজগৎকে উদ্ভাসিত করতে এই ছড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

> "এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই।"[১৮]

---

[১৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন ঃ মেঘদূত (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৮৬), পৃষ্ঠা ৮৫।

[১৭] সংকলন ঃ শকুন্তলা, ঐ, পৃষ্ঠা ৯৮।

[১৮] সংকলন ঃ ছেলে-ভুলানো ছড়া, ঐ, পৃষ্ঠা ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও অগ্রসরমান। এ উপন্যাস পাঠকের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে পরিণামের দিকে ধাবিত করে। কিন্তু অন্যান্য লেখকের উপন্যাস শুরুতেই পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে তোলে। সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা পাঠকের মাথায় জগতের ভার চাপিয়ে দেন। 'রাজসিংহ' প্রবন্ধ সম্পর্কে উপন্যাস মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।"[১৯]

পাঁচ

লেখকের অন্তর্জীবনের ছাপ সাহিত্যের ভেতরে ফুটে ওঠে। এ মত শশাঙ্কমোহন সেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত সমর্থন করেছেন। প্রাচীন লেখকগণ বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ, দেশ ও মানুষকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন।

কাব্যের জগৎ হলো মায়ার জগৎ। সেজন্য কাব্যকে অন্তর্জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। কবিত্বের প্রথম কথাই হচ্ছে সকল রকম সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হওয়া। কবি খুঁজবেন বিশ্বভাব, বিশ্ববাক্-এমন ভাব যা জাতি বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই অনুভব করতে পারে।[২০] বিশ্ব ভাবকে বুঝতে হলে নিজের আত্মাকে ধরতে হবে। আত্মাই হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র। আত্মাকে ধরতে পারলে বিশ্বকে সহজে আলিঙ্গন করা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে এই বিশালতা ও সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। দান্তে, হোমর, বাল্মীকি বা প্রাচীনতম বৈদিক ঋষিগণের রচনায় বিশ্ব সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[২১] তাঁরা বৃহৎ

---

১৯ সংকলন ঃ রজসিংহ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৩।

২০ সাহিত্যিকা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩।

২১ ঐ, পৃষ্ঠা ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যকে অধিগত করে প্রাণ-মনকে-অজ্ঞানের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করে অমৃতের দুয়ারে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্তরের সত্যকে তাঁরা অপরের কল্যাণ ও মঙ্গলের তরে ব্যয়িত করেছেন। তাঁরা বৃহৎকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২২]

কবিরা ভাবজগতের অধিবাসী, ভাবই তাঁদের জীবনের প্রধান উপজীব্য। তাঁরা ভাবুকতার শক্তি দেখিয়ে জগৎকে আকৃষ্ট করতে চায়, সে জন্যই তাঁদের অন্তর্জীবনের দিকে মানুষের প্রধান দৃষ্টি। কবিদের অন্তর্জীবনকে বুঝতে পারলে তাঁদের কাব্য সাহিত্যকেও বুঝা যায়। সেই দৃষ্টি ভঙ্গীতে শশাঙ্কমোহন সেন মধুসূদনের সাহিত্যকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

> "কবিগণ নিজের অন্তরাত্মাকে কাব্যের মধ্যে পরের ভোগযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; আপনার ভাবনা এবং চিন্তাগুলিকে জগতের খাদ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারেন; তাই কাব্য উপাদেয়। কিন্তু কাব্যপাঠের প্রকৃত রসবোধ বলিয়া যে জিনিষ, উহার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে জানিতে পারিলে যেমনটি হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না।"[২৩]

সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনের ভাল-মন্দের উপরই নির্ভর করছে সাহিত্যের গুণাগুণ। আধুনিক বাংলা কাব্য জগৎ বা অন্যান্য জগৎ প্রচারসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রশান্ত সৌন্দর্যানুভূতি এখানে অতি বিরল। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসা ও আলোচনা এখন সাহিত্যের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, সাহিত্য এখন সুকুমার শিল্প না হয়ে নীতি ও ধর্মশাস্ত্র হয়ে পড়েছে। ভাববাদকে পরিহার করে বাস্তববাদকে পুঁজি করে আধুনিক কবিতার জন্ম হচ্ছে। এতে দেশের বাহ্য জীবন ও কাজের সমস্যাগুলিই প্রকট হয়ে উঠছে।[২৪]

---

২২ রূপ ও রস, নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খন্ড, (কলকাতা ঃ শৃণ্বন্তু, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ১৩৮।

২৩ মধুসূদন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭।

২৪ রূপ ও রস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান কালের সাহিত্যিকগণ জীবন ও জগৎকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখছেন। সে কারণে তাঁরা সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং আর্টকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করছেন। প্রাচীন কাব্যশিল্প ছিল বস্তুর সুপরিস্ফুট প্রমূর্তিবাদী, আর আধুনিক শিল্প হয়েছে বিশেষভাবে বস্তুর সঙ্কেতবাদী। সেকারণে প্রাচীন ও বর্তমান কালের সাহিত্য রচনার ভাবগত পরিবর্তনটাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃত সাহিত্যিক অন্তর্জীবনকে মুখ্য ভাবে গ্রহণ করেন। সাহিত্য জগতের পক্ষে কবির এই ভাবময়-অন্তর্দেহ এবং বাণীক্ষেত্রে তার উপায়নটুকুই মুখ্য বিষয়। কবি নিজ অন্তরাত্মাকে কাব্যের মধ্যে অপরের ভোগযোগ্য করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন; নিজ ভাবনা ও চিন্তাকে জগতের ভোগ্যরূপে উপস্থিত করেন। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকারের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি।

মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বাংলার চিরার্জিত সংস্কারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্যের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধি করেন। তাঁর সমগ্র কাব্য জুড়ে পাত্র-পাত্রীগণ অপরিহার্য দৈব দুঃখের মহাপাশে পড়ে কেবল ছট্‌ফট্ ও হা-হুতাশ করেছে। এর মধ্যে সংসারবাসী মনুষ্য-আত্মার চিরকালীন ক্রন্দনের সোদরত্ব এবং সমতা আছে। এ ভবজীবনের অপরিহার্য রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশা এবং মৃত্যু-পরাজয়ের মর্মগত প্রতিকৃতিটুকু আছে।[২৫] এতে মধুসূদনের শিল্পতা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর কাব্যের পরিকল্পনা, ভাষায় ভাব ও বস্তুর পরিকল্পনা, প্রত্যেক কাব্যশ্লোকের গতি ও উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ করেছে।[২৬]

রবীন্দ্রনাথের জগৎ হলো কল্পলোকের। তাঁর প্রাণের সূক্ষ্ম তন্ত্রী স্থূল জগৎকে এড়িয়ে সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করেছে। তাঁর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অতীন্দ্রিয়ের অশরীরী। সেজন্য কোন কিছুতেই তিনি তৃপ্ত হ'ননি। দৃষ্টির

---

[২৫] মধুসূদন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭।

[২৬] ঐ, পৃষ্ঠা ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্টতা তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেনি। তাই তাঁর মধ্যে একটা অতিসন্তর্পণতা ও দ্বিধা বিদ্যমান। যদিও তাঁর সত্য গভীর, সূক্ষ্ম ও উদার, কিন্তু তারপরও তাঁর মধ্যে সন্দেহের অস্পষ্টতা দূর হয়নি। এ প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত 'সাহিত্যিকা' গ্রন্থে বলেছেন -

> "মানস জগৎ ছাড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তুরীয় জগৎ, কিন্তু তুরীয়েরও একটা মানসসত্তা আছে সেইটুকু রবীন্দ্রনাথ ধরিতে পারেন নাই- তিনি তুরীয়কে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন কেবল ভাবুকতার আবেগে-তপঃশক্তির তীব্রলেখায় তাহাকে জাজ্বল্যমান করিয়া ধরিতে চান নাই।"[২৭]

ছয়

কবিতাসৃষ্টির কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে চারটি রীতি লক্ষ্য করেছেন ঃ শব্দরীতি বা গৌড়ী রীতি, রোমান্টিক বা রাগাত্মক রীতি, ক্লাসিকাল বা অর্থাত্মক রীতি এবং ভাবাত্মক বা আত্মিক রীতি। এ সকল রীতি অবলম্বন করে কবিতা রচিত হয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত চারটি রীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন; শব্দের ঝঙ্কার, বাক্‌চাতুর্য, অলংকার, অনুপ্রাস প্রভৃতির সমন্বয়ে শব্দরীতি বা গৌড়ীরীতি কবিতার সৃষ্টি। এ রীতির কবিকে শব্দ কবি বলা হয়। কবি এই শব্দ রীতিকে অতিক্রম করে আরেক ধাপ উপরে উঠে এসে ছন্দের ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে কবিতায় রস বোধের সঞ্চার করেন। এই শ্রেণীর কবিকে রস-কবি বলা যায়। রোমান্টিক বা রাগাত্মক রীতিই এঁদের আদর্শ। তাঁরা এক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে রসের ধারা বইয়ে দেন। ক্লাসিকাল বা অর্থাত্মক রীতির কবিরা স্পষ্ট চিন্তাকে বিশেষ অর্থে প্রকট করে কবিতাকে অর্থগম্ভীর করে তোলে। এতে বিষয়, বক্তব্য, বস্তু নির্দেশ প্রাধান্য লাভ করে। এঁদেরকে দার্শনিক কবি বলা হয়। সর্বশেষ স্তরের কবিরা তুরীয় মার্গে বিচরণ করেন। এক্ষেত্রে কবিরা ভাবলোকে বিচরণ করে আত্মসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন।

---

[২৭] সাহিত্যিকা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী এই স্তরে এসে হয়েছেন ঋষি। ভাবাত্মকতা আত্মিক রীতির কবিতাকে মিস্‌টিক কবিতাও বলা যেতে পারে।[২৮]

'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) কাব্যের চারটি লক্ষণের কথা বলেছেন ঃ ধ্বনি, রস, কথা এবং ফললাভ। প্রাচীন আলংকারিকদের বিচারে রসকেই কাব্যের আত্মা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। লেখকের মতে এর চেয়ে খাঁটি কথা কোনো কালে কেউ বলেনি।[২৯] তাইতো কবির কাজ পাঠকের চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটানো।[৩০] এভাবেই কবি কাব্য সৃষ্টির মধ্যদিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটাতে সক্ষম হ'ন। মানব মনের এই আনন্দঘন রসের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে পরমাত্মার স্বরূপ।

সাত

এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) ও কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) মতে, সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ মাতৃভাষার প্রতি অনীহা। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ায় তাঁদের সাহিত্য যুগোপযোগী না হয়ে প্রাণহীন আড়ষ্ট এবং জড় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষার চর্চার মধ্যদিয়ে সাহিত্য চর্চার ধারাকে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টিতে প্রবাহিত করা প্রয়োজন। তবেই জাতির কল্যাণ সাধিত সম্ভব।[৩১]

---

[২৮] রূপ ও রস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮-১৩০।

[২৯] অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৩), পৃষ্ঠা ২৩।

[৩০] ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬।

[৩১] মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী, প্রথম খন্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতের মুসলমান সমাজ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিচার করেছেন। ফলে এ সমাজে বাংলা ভাষার চর্চা তেমনভাবে বিকাশ লাভ করেনি। আরবী ভাষার প্রতি মোহ জন্মাবার কারণে বাঙালীর চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরী হয়েছে। 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন -

> "চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে' দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা।"[৩২]

সমকালীন উচ্চবিত্ত মুসলমান আরবী-ফার্সীর চর্চা করতেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল প্রচন্ড রকমের। তাঁরা বাংলা ভাষাকে বিজাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমান সমাজের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চা প্রচলন থাকায় সে সময়ে সাহিত্যের একটা দিক বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কিন্তু ধর্মান্ধ আলেম সমাজ শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে এথেকে নিবৃত করার চেষ্টা করে।[৩৩]

আধুনিক সাহিত্যের ভেতরে রয়েছে মানব জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার অমোঘ শক্তি। এ সাহিত্য ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রীয়-জীবন ও আধ্যাত্মিক-জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলতে চেষ্টিত। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই সাহিত্যিকগণ আত্মবিকাশের পাশাপাশি দেশের ভাব-মূর্তিকেও উজ্জ্বল করে তোলতে পারেন।

---

৩২ নবপর্যায় ঃ বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা, দ্বিতীয় খন্ড, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা ঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৩২৪।

৩৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভাধর লেখক নিজ-নিজ প্রতিভা বলে দেশকে পৃথিবীর মাঝে নতুন করে পরিচয় করে দিতে পারেন। ফার্সী সাহিত্যে কবি ফেরদৌসী (৯৩৭-১০২০) তাঁর সাহিত্য কর্মের ভেতর দিয়ে পারস্যকে নতুন ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

> "ফার্সী ছিল শিশু, আধো আধো তার বোল, পলকে সেই হয়ে উঠ্‌ল জওয়ান। আর সে জওয়ানীও যে-সে জওয়ানী নয়-রোস্তমের পাহলোয়ানীর যোগ্য।"

লিখেছেন কাজী আবদুল ওদুদ।[৩৪] তিনিও বাংলা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানকে জেগে ওঠার আবেদন করেছেন।

---

[৩৪] নবপর্যায় ঃ সাহিত্যে সমস্যা, প্রথম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ

দীর্ঘকালের ইংরেজ শাসন বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধর্ম, সমাজ ও জীবনের মৌলিক মূল্যবোধ রূপান্তরিত হওয়ায় সাধারণ জন সমাজের মধ্যে ভাব-সংঘাত তীব্রতর হয়েছিল। কু-সংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) কেন্দ্রিক 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের (১৯২৬-১৯৩৬) মুখপত্ররূপে 'শিখা' (১৯২৭-১৯৩১) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজ হিতৈষীগণ এ পত্রিকার মাধ্যমে অন্ধ ধর্মানুরক্তি, কু-সংস্কার ও কুপ্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

তৃতীয় দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার বিস্তার।[১] ঢাকা-কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে এই দশকে অনেকবার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে যেভাবে দুই সম্প্রদায় এই দশকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছিল, সেক্ষেত্রে দাঙ্গার আকস্মিক বিস্তার রহস্যজনক মনে হয়। অনেকে এর পেছনে শাসক ইংরেজের চক্রান্ত অনুমান করেছেন। যদিও দাঙ্গা সংঘটিত হবার মুল কারণ ছিল আর্থ-সামাজিকগত ব্যবধান। এছাড়াও রাজনৈতিক, সম্প্রদায়গত, ভাষাগত, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদেশী ষড়যন্ত্রের ফলে এর ব্যাপকতা ঘটে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বাংলার সামাজিক বন্ধন দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহে প্রথম হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত ঘটে।[২]

---

১ শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস (কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০১), পৃষ্ঠা ৪০-৪৩।

২ Suranjan Das, Communal Riots in Bengal 1905-1947 (Delhi : Oxford University Press, 1991), পৃষ্ঠা ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজ জীবনের এই অস্থিতিশীলতার মধ্যেও সেকালে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই দশকে সমাজ-বিষয়ক নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

১. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রূপক ও রহস্য (১৩৩০)
২. অন্নদাশঙ্কর রায়, তারুণ্য (১৯২৮)
৩. আবুল হুসেন, বাংলার বল্‌শী (১৩৩২)
৪. ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, নারীর উক্তি (১৯২০)
৫. কাজী আবদুল ওদুদ, নবপর্যায়, প্রথম খন্ড (১৩৩৩); দ্বিতীয় খন্ড (১৩৩৬)
৬. খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা, ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (১৯২৬)
৭. ডাক্তার মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান, মহৎ-জীবন (১৩৩৩); মানব-জীবন (১৩৩৪)
৮. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ-মালা (১৩২৭)
৯. প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা (১৯২৬)
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন (১৩৩২); যাত্রী (১৩৩৬)
১১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারীর মূল্য (১৯২৩)
১২. এস. ওয়াজেদ আলি, মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য (১৩৩২); বাঙ্গালী-মুসলমান [অভিভাষণ] (১৯৩০)

যৌবন ধর্ম; মুসলমান সমাজের অতীতমুখিতা; নারী স্বাধীনতা; পাশ্চাত্য প্রভাব ও পরনির্ভরতা; মানবিক মূল্যবোধ; বাংলার কৃষক সমাজ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এ সকল বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

যৌবন ধর্ম

অন্নদাশঙ্কর রায়ের (জন্ম ১৯০৪) 'তারুণ্য' গ্রন্থে যৌবন সম্পর্কিত নানা দিক আলোচিত হয়েছে। যৌবন হচ্ছে মানুষের সৃষ্টিশীল কাজের উর্বরা ভূমি। ব্যক্তিগত ও জাতিগত যৌবন ধর্মের উপর নির্ভর করে সমাজ তথা দেশের উন্নতি এবং মঙ্গল। কিন্তু বাঙালী সমাজ একে এড়িয়ে চলেছে বলেই আজ সে জরাগ্রস্ত ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। বিদেশী শাসন ও শোষণে এ জাতি নিষ্পিষ্ট।

যে জাতির জীবনে মানসিক যৌবনের প্রভাব বেশী, সে জাতি তত সমৃদ্ধ ও উন্নত। বাংলার সমাজ জীবনে এই মানসিক যৌবনের প্রভাব তত বেশী নয় বলেই বাঙালী সব ক্ষেত্রে অন্য জাতির তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য কর্মের মধ্যে যৌবনের গুণকীর্তন করে যৌবন ধর্মকে ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়ে রচিত তাঁদের প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি বলে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

জরাগ্রস্ত জাতি কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। যৌবন ধর্মের সাধনার মধ্য দিয়ে জাতিকে এ থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। প্রকৃত যৌবনের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থেকে বাঙালী দিন দিন হীনবীর্য হয়ে পড়েছে। প্রকৃতি হচ্ছে প্রকৃত যৌবনের অধিকারী। প্রতি বছর প্রকৃতি নতুন নতুন রূপে মানুষের দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রকৃতির এই সতেজ ও সজীব রূপকে জরা স্পর্শ করতে পারে না। প্রকৃতির সজীবতা যখন মানুষের মনকে স্পর্শ করে যৌবনের রঙে রাঙিয়ে দেয় তখন সমাজের জরাগ্রস্ত কিছু লোক তা দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। যৌবনের কাজ হচ্ছে সমাজের প্রাচীন নিয়মনীতি ভেঙ্গে সমাজ জীবনে নতুন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করা। অন্নদাশঙ্কর রায় 'তারুণ্য' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"গেল। গেল। গেল। প্রাণ গেল। মান গেল। ধর্ম গেল। সমাজ গেল। এবং ইদানীং শোনা যাচ্ছে, সাহিত্য গেল।"[৩]

মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সময় হলো যৌবন। যৌবনেই মানবজীবনের কর্মচাঞ্চল্যের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। কিন্তু বাঙালী একে এড়িয়ে চলতে সদাই সচেষ্ট। তাই তারা প্রতিক্ষেত্রে অন্য জাতি থেকে পিছিয়ে আছে। তাদের সনাতন আদর্শ ও মূল্যবোধ সমাজকে পরাধীন জাতিতে পরিণত করেছে; এবং যৌবনের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সমাজের জরাগ্রস্ত মানুষ যৌবনের টুটি চেপে ধরার জন্য সততই ব্যতিব্যস্ত। তারা যৌবনের বিকাশকে সব সময় ভয় করে।

"যৌবনকে আমাদের দেশে অতি বিষম কাল বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। সেই জন্য যৌবনাগমের পূর্ব হতেই যৌবনকে শায়েস্তা রাখবার জন্যে আমাদের স্থবিরতন্ত্র সমাজ দুটি উপায় করেছে। একটি, জাতি প্রথা। অন্যটি, বাল্য বিবাহ।"[৪]

ভারতীয় সমাজ নারীদের সতীত্বকে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছে। কিন্তু তাঁরা জাতিকে তেমন কোন মহাবীর ও মহামানব সন্তান উপহার দিতে পারেননি। তারা জীবন থেকে প্রেমকে বাদ দিয়ে সতীত্ব হারানোর ভয়েই সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। সমাজ এখানেও যৌবনের টুটি চেপে ধরে মানুষের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

---

৩ তারুণ্য, অন্নদাশঙ্কর রায় রচনাবলী, প্রথম খন্ড (কলকাতা ঃ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ৩৯৪।

৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

"নারী তার দেহটাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে যতই অসংযত হোক তার সতীধর্মে বাধে না, এমন কি সে স্বামী যদি অপর নারীরও স্বামী হয়ে থাকে। কিন্তু সে নিজে অপর পুরুষের স্ত্রী হওয়া দূরের কথা, আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি অপর পুরুষের দ্বারা স্পৃষ্টা বা দৃষ্টা হয় তবে তৎক্ষণাৎ হাঁড়ির ভাতের মতো ঘর থেকে ফেলা যায় নর্দমায়। মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত সতী নামটা বাঁচিয়ে রাখা নারীর কীর্তি নয়, ভাগ্য।"[৫]

ভারতবর্ষে যে সকল মনীষী জন্মেছিলেন, তাঁরা যদি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করতেন তবে তাঁদের প্রতিভা আরো বিচিত্র হতে পারতো। এ সমাজ যে সকল নারীকে অসতী বলে ধিকৃত করেছে তাঁরাও যদি ইউরোপে জন্মাতেন তবে তাঁরাও কীর্তি রেখে যেতে পারতেন। ইউরোপীয় সমাজ প্রেমকে বিশ্বাস ও সম্মান করে। সেখানে সন্ন্যাসের প্রভাব নেই, আছে প্রেমের স্বাধীনতা। এখানে নারীর মাধুর্যই পুরুষের শক্তি। এক্ষেত্রে ভারতীয় মহাপুরুষগণ প্রেমকে অস্বীকার করে বনে-জঙ্গলে গিয়ে মোক্ষলাভের সাধনা করেছেন। ইউরোপ যৌবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই জাতি হিসেবে সে উন্নত হতে পেরেছে। 'তারুণ্য' প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"মানুষের ইতিহাসে যখন যে জাতির মধ্যে যৌবনের বন্যা নেমেছে তখনি সে জাতি দুই কূল ভাসিয়েছে। অন্তর্জগৎ বা বহির্জগৎ আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক দেহ বা মন কোনো একটা কূলের প্রতি তাঁর একান্ত পক্ষপাত ঘটেনি। গ্রীস রোমের যখন যৌবন ছিল তখন তারা দুইদিকে সাম্রাজ্য জিনেছিল, মাটির উপরে ও মনের ভিতরে। আধুনিক ইউরোপ আপন আত্মার গুহা থেকে যৌবনের তত্ত্ব উদ্ধার করেছে, তাই পৃথিবীর অর্ধেক ছাপিয়েও সে আপনার কূল পায়নি।"[৬]

---

[৫] ঐ, পৃষ্ঠা ৪১৯-৪২০।

[৬] ঐ, পৃষ্ঠা ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

মুসলমান সমাজের অতীতমুখিতা

মুসলমান সমাজের মঙ্গল ও উন্নতি নিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ, এস. ওয়াজেদ আলি প্রমুখ চিন্তাবিদ গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ 'নবপর্যায়' (প্রথম খন্ড); 'নবপর্যায়' (দ্বিতীয় খন্ড) এবং এস. ওয়াজেদ আলি 'বাঙ্গালী মুসলমান' [অভিভাষণ], 'মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে মুসলমানের দুরবস্থা, ধর্মীয় কুসংস্কার অশিক্ষা এবং চিন্তা চেতনায় পশ্চাৎপদতা নিয়ে আলোচনা করেছেন; এবং সেই সাথে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কথাও বলেছেন।

ব্যক্তিগত চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাই হচ্ছে জাতির সর্ববিধ উন্নতির উপায়। যে সমাজে এ স্বাধীনতা নেই, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না; পারে না সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে। ফলে উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ জীবনও সেখানে গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। মুসলমান সমাজ অতীতমুখী; ধর্মের বিভিন্ন বন্ধনে এ সমাজকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ধর্মীয় কুসংস্কার ও নারীজাতির প্রতি বৈষম্যই এদেরেকে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে। সেজন্যই মুসলমানের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ এখানে রুদ্ধ। সমাজের চারদিকে হীনতা, নিরক্ষরতা, সমাজ-নেতৃবৃন্দের বিচার মূঢ়তাও তাদের দৃষ্টিহীনতার কুফলে সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে। আধুনিক তুরস্কের রূপকার কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) মুসলমান সমাজের নবজীবনারম্ভের এক চমৎকার পূর্বসূচনা করেন। অন্যদিকে বাঙালী মুসলমান সমাজ মধ্যযুগীয় অন্ধকারের ভেতরেই হাবুডুবু খাচ্ছে। এস. ওয়াজেদ আলি তুরস্কের পথকে অনুসরণ করে বাঙালী মুসলমানদের এগিয়ে যাবার প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেছেন।

> "তুর্কীদের জাতীয়তা আদর্শের অনুসরণ করাই হচ্চে আমাদের কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের চেয়ে তুরস্কের লোকেরা বেশী উন্নত। তুর্কী নেতারা তাই তুরস্কের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনকে

Dhaka University Institutional Repository

> অন্যান্য দেশের মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নূতন বর্ত্তমান কালের উপযোগী আদর্শ এবং সমাজ-ব্যবস্থা সেখানে চালিয়েছেন।"[৭]

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ঢেউ বাঙালী মুসলমান সমাজকেও নাড়া দেয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' জন্ম হয় (১৯২৬)। সাহিত্য সমাজের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা শুরু হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার কারণে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। যুক্তিবাদ, মনুষ্যত্ববোধ ও আধুনিকতার যাত্রা এই সাহিত্য সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। মানুষ এ সময়ে নতুন করে নিজেকে অবিষ্কার করে-মানব-মনীষার বন্ধন মুক্তি ঘটে নানা বিচিত্র পথে-শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও মনুষ্যত্বের চেতনায়। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল অন্ধ সংস্কারের থেকে মুক্তি, শাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবর্তনের বদলে যুক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা; সর্বোপরি সম্প্রদায় ভিত্তিক চিন্তার স্থানে ব্যাপক মানবহিতের প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে। অতীতের সামনে থেকে মুখ ঘুরিয়ে না নিলে মুসলমান সমাজের উন্নতি সুদূর পরাহত। কাজী আবদুল ওদুদ নবপর্যায়ের 'চলার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> "অতীতকে জানো অতীত বলে', 'মৃত বলে'। তার যে অংশ সজীব সে তুমি। শুধু তোমার মুখেই অতীত কথা বলতে পারে, - পন্ডিতের মুখে অতীত যে সময় সময় কথা বলে সে Ventriloquism। ইসলাম কি, মুসলিমত্ব কি, তারও সত্যকার পরিচয় পাবে অতীতে নয় তোমারই জীবনে। তুমি বুদ্ধিমান কর্মানুরত সমাজ-ধর্মী মানুষ হও, পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশ কোনো মায়ার ছলনায় তোমার ভিতরে ব্যাহত না হোক্-তুমিই হ'বে ধার্মিক রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সাংসারিক রূপদক্ষ; মুসলমানত্ব হিন্দুত্ব খৃষ্টানত্ব এসব কিছুর রূপ ফুটবে তোমারই ভিতরে।"[৮]

---

[৭] বাঙ্গালী মুসলমান [অভিভাষণ], সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী, প্রথম খন্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৩৭।

[৮] নবপর্যায়, দ্বিতীয় খন্ড ঃ চলার কথা, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা ঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজজীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব। সঠিক ইতিহাস সৃষ্টির ভেতর দিয়েই মুসলমান সমাজ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলে চলতে সক্ষম। অতীতের অন্ধ ইতিহাস ঘেটে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে। এতে এ সমাজ অন্য সমাজের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। মুসলমানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গতানুগতিকতাকে ধূলিসাৎ করে' দিয়ে, নতুন করে তা ঢেলে সাজাতে হবে। এ সমাজ হজরত মোহাম্মদকে দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তার মানবতাবাদী চরিত্রকে অলৌকিক চরিত্রের আসনে বসিয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের মতে ঃ

> "ছোটখাটো প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেলেও "প্রেরিতত্ব" রূপ এক প্রকান্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁরা যে জীবন পাত করছেন, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা সাংসারিকতা সবদিক থেকেই তা শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।"[৯]

নারীর অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করে শিল্পকলা চর্চার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে মুসলমান সমাজকে পেছনের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে মুসলমান নারী যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এ সমাজ তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। অন্যদিকে সুদ প্রথার উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপের ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকেও এ সমাজ পিছিয়ে পড়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেনঃ

> "ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান-প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিতকলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে' দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা।"[১০]

---

৯ নবপর্যায়, প্রথম খন্ড ঃ সম্মোহিত মুসলমান, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা ঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৩৯৫।

১০ নবপর্যায়, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বিধি-নিষেধের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত হয়ে মুসলমানদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। সমাজ জীবনের বৈচিত্র্য হতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার ফলে সমাজের অর্ধেক শক্তি ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। সেই সাথে তাদের মনে সঙ্কীর্ণ মনোভাবেরও জন্ম নিয়েছে। এ সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে হলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী জ্ঞান চর্চার বিকাশ ঘটাতে হবে। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। সমাজ হতে কুসংস্কার ও অন্ধ অনুবর্তিতা দূর করতে সাহিত্যিকদেরও একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যিকগণ ইসলামের প্রাচীন গৌরব গাথা ইতিহাসকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করে মানুষের মনের ভ্রান্ত ধ্যান ধারণাকে পাল্টে দিতে পারেন।

বাংলার উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কের উপরই নির্ভর করছে দেশের উন্নতি, বিকাশ ও কল্যাণ। এস. ওয়াজেদ আলি 'বাঙ্গালী মুসলমান' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> "মুসলমানকে হিন্দু কালচারের সম্মান করতে হবে, হিন্দুকে মোসলেম কালচারেরও সম্মান করতে হবে; আর এই দুই কালচারের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান এবং স্থায়ী জিনিষ আছে তার কদর উভয়কে করতে হবে। আর আস্তে আস্তে, মানুষের দৃষ্টি অতীত থেকে বর্ত্তমানের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এবং অ-বর্ত্তমানের বিষয় ভাববার যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে তাকে ভবিষ্যৎমুখী করতে হবে।"[১১]

---

[১১] বাঙ্গালী মুসলমান [অভিভাষণ], পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

চার

নারী স্বাধীনতা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার 'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ'; কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্যায়' প্রথম খন্ড; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -এর 'নারীর মূল্য' এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর (১৮৭৩-১৯৬০) 'নারীর উক্তি' প্রবন্ধে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নারী জাতির উপর অত্যাচার চলেছে। এ অত্যাচার হয়েছে কখনো ধর্মীয় বিধি-বিধানকে কেন্দ্র করে, আবার কখনো বা পুরুষের পেশী শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনের লক্ষ্য নিয়ে। নারী জাতিকে দূরে সরিয়ে রেখে সমাজ তথা দেশের মঙ্গল ও উন্নতির পথকে রুদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মের অজুহাতে তাদেরকে সাধন ক্ষেত্রের পরিপন্থি হিসেবেও আখ্যয়িত করা হয়েছে। আবার কোন -কোন ধর্ম নারীকে নরকের দ্বারের সঙ্গে তুলনার পাশাপাশি তাদেরকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করতেও পিছপা হয়নি।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্থান ও কালের বিবেচনায় নারীর মূল্য নির্ধারণ করা হতো। পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে সব সময় ভোগের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নারীত্বের সম্মানকে সমাজ তেমনভাবে মূল্যায়ন করেনি। শুধুমাত্র পুরুষের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই সমাজে নারীর মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। প্রাচীন কালে নারী বেদ রচনা করেছে। কিন্তু বর্তমানে বেদের কথা শোনাই নারীর জন্য নিষিদ্ধ। ভারতবর্ষের শাস্ত্র-সংহিতা ও সাহিত্যে নারীকে প্রায় স্বর্গের দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, আবার পাশাপাশি পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর অসম্মানও চূড়ান্ত আকার লাভ করেছে। নারীকে নরকের দ্বারের সঙ্গে তুলনার পাশাপাশি কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র, কোকশাস্ত্র, শৃঙ্গার শতক প্রভৃতি গ্রন্থে ষোড়শোপচারে অনঙ্গরঙ্গিনী নারীর শারীরতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

একাধারে নারীকে ভোগের জান্তব উপাদান বলে শিরোধার্য করা আবার পরক্ষণেই তাকে ছলনাময়ী বলে পদাঘাত করা-এই দুই মানসিকতাই অসুস্থ ও বিকৃত। আধুনিক ভারতীয় হিন্দু সমাজে নারীকে 'মহাভাগা' বলে সম্মান করা হয়, জননীত্বকে নারীত্বের একমাত্র পরিণাম বলে ঘোষণা করা হয়।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এ ধর্মে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। হজরত মোহাম্মদ নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু যুগে যুগে পুঞ্জীভূত শাস্ত্রজ্ঞানের কঠোর হস্ত নিপতিত করে গোঁড়া আলেম সমাজ মুসলমান নারীর সুপবিত্র, সুবিহিত, যুগযুগান্তরাগত অবরোধের মধ্যদিয়ে হজরতের আদেশকে লঙ্ঘন করেছেন।[১২] ইউরোপের আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা অবনমিত হয়েছে সামাজিক কারণে এবং সে কারণগুলি সৃষ্টি হয়েছে পুরুষ-শাসিত সমাজ দ্বারা। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম নারী জাতিকে উচ্চতর স্থানে স্থান দিয়েছে। ইসলাম একাধিক বিয়ের প্রস্তাব সমর্থন করে নারী জাতিকে খারাপ পথ থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছে। হিন্দুধর্মে মনু স্ত্রীজাতিকে অপবিত্র, অসৎ চরিত্রা বলে মনে করেছেন।[১৩]

সুস্থ ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়তে হলে সমাজে নারী জাতির সঠিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সে জাতি নারীকে সম্মান করতে পেরেছে, সে জাতি ততই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

> "ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাপান। সে কেবল তাহার নারীর স্থান উন্নত করিতে পারিয়াছে সেই দিন হইতে, যে দিন হইতে সে তাহার সামাজিক রীতি-নীতির ভালো মন্দর বিচার ধর্ম্মের এবং ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর

---

১২ নবপর্যায়, প্রথম খন্ড, মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৭।

১৩ খানবাহাদুর, আহ্ছানউল্লা, ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (ঢাকা ঃ জয় পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আঁচড়-কামড়ের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও যেখানে চীনাদের মত নারীর দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না।"[১৪]

আধুনিক কালে নারী শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটায় সমাজে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে নারীর স্বাধীনতা আজ স্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে যদিও এ পরিবর্তন অনেক পূর্বেই সাধিত হয়েছে। কিন্তু কোন-কোন ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা বিষফোঁড় হয়ে সমাজের বুকে চেপে বসেছে। তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা ভয়ানক আকার ধারণ করে সুখের সংসারকে লন্ড-ভন্ড করে দিচ্ছে। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী এ প্রসঙ্গে 'নারীর উক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

"স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-শিক্ষারই অগ্রবর্ত্তী উত্তরাধিকারী। এই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে' মেয়েদের অকাল স্বাধীনতা দেওয়ার কোন সুফল আমি ত দেখতে পাই নে।"[১৫]

বাঙালী পুরুষেরা মেয়েদের মন-প্রাণ ছিল বলে বিশ্বাস করতে চাইতো না। ফলে নারীজাতির স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না সাধ-আহলাদ। মুখ বুঁজে তাদের সব কিছু সহ্য করতে হতো। বর্তমানেও এর তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। 'নারীর উক্তি' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"বাঙ্গালী মেয়েদের নিশ্চিন্ত বাল্য জীবন নাই বলিলেই হয়। বালিকা বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই তাহারা বিবাহিতা ও অন্তঃপুরবদ্ধা; কিশোরী না হইতেই মাতৃব্রতে দীক্ষিতা ও সংসার পাশে বিজড়িতা; যুবতী না হইতেই হয়ত বৈধব্যের নির্ব্বাণ প্রাপ্তা। তাহারা কি রক্ত মাংসের জীব নহে? বিধাতা কি তাহাদের মানুষ করিয়া গড়েন নাই ? আকাশ, বাতাস, আলো, গাছপালা, মানুষের মুখ; কাব্য ও সঙ্গীত রস মাধুর্য্য,

---

১৪ নারীর মূল্য, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, নবম সম্ভার, ষষ্ঠ মুদ্রণ (কলকাতা ঃ এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ কাল নেই), পৃষ্ঠা ৩৬৫।

১৫ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, নারীর উক্তি (কলকাতা ঃ প্রমথ চৌধুরী, ১৯২০), পৃষ্ঠা ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহচর্য্য অবসরের নিশ্চিন্ত আরাম-এ সকলে কি তাহাদের কোন অধিকার নাই ? বাল্যের সরল আনন্দ, বার্দ্ধক্যের স্নিগ্ধ বিশ্রাম কি তাহাদের পক্ষে আবশ্যক নহে ? এই ত সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন সম্মুখে প্রসারিত, তাহার মধ্যে কি সামান্য আমোদ প্রমোদও তাহাদের পক্ষে দূষণীয় ?"[১৬]

সেকালে হিন্দু-সমাজে সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক প্রথার প্রচলন ছিল। সমাজে বিধবাদের বিয়েও নিষিদ্ধ ছিল। এহেন ঘৃণ্য কাজকে সমাজের ধর্মীয় শাস্ত্রবিদগণ সাধুবাদ জানিয়েছেন। তখন সমাজ জীবনে মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনি প্রতিনিয়তই আকাশ-বাতাসে ভেসে বেড়াত। আধুনিক কালেও এর তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। জাতিভেদ বুদ্ধি ও পূর্ব সংস্কার সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে এতই মজ্জাগত যে, বাইরের নিষেধ রহিত হলেও, ভেতরের অপ্রবৃত্তি প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক পর্যায়ে নারীদেরকে গৃহপালিত জন্তুর মতো ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো। যদিও বর্তমানে শিক্ষিত পরিবারে তার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। এ সমাজে নারীরা ইচ্ছে করলে স্বামীকে তালাক দিতে পারে। পাশ্চাত্যের এ প্রথাটি বাংলার শিক্ষিত নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু গ্রামীণ নারীরা যে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল বর্তমানেও ঠিক সেই অবস্থাতেই নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থাতেই নারীরা সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত হচ্ছে। এখানে সমাজপতি ও ধর্মীয় শাস্ত্রবিদগণের কঠোর শাসনে নারীরা প্রতিনিয়তই অত্যাচারিত হচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যদি নারী স্বাধীনতা না থাকে তবে দেশ তথা সমাজের উন্নয়ন এবং মঙ্গল যেমন সাধিত হবে না, তেমনি মানবাধিকারও হবে লঙ্ঘিত।

---

[১৬] ঐ, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ

পাশ্চাত্য প্রভাব ও পরনির্ভরতা

ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের স্পর্শে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এর প্রভাব বাঙালীর মনোজীবনে প্রবিষ্ট হয়ে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেয়। শিক্ষা-দীক্ষায় তারা বিদেশীদের অনুকরণ করতে শুরু করে। এতে করে তাদের বাইরের পরাধীনতার পাশাপাশি মনোজগতকেও অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)-এর 'প্রবন্ধ-মালা' (১৩২৭); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) 'সংকলন' (১৩৩২), 'যাত্রী' (১৩৩৬); ডাক্তার মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) 'মহৎ-জীবন' (১৩৩৩), 'মানব-জীবন' (১৩৩৪) গ্রন্থের কোন-কোন প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটে। আধুনিক কালে ইংরেজরা এদেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করে। ফলে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়। ব্রিটিশের আগমনে এদেশ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে তাঁর 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> "পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে।"[১৭]

আধুনিক বিশ্বে এক দেশ অন্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে উন্নতি করছে। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে পুরানো ধ্যান-ধারণা পরিহার করে নতুন যুগের

---

[১৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৮৬), পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তাহলেই দেশ ও দশের মঙ্গল এবং কল্যাণ সাধিত হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের যুগসূত্র স্থাপন করতে প্রয়াসী হন। তিনি কোনো অন্ধ-সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে উদার বুদ্ধির দ্বারা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে পরিহার না করে ইউরোপের ভাল দিকগুলি গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়েছিলেন।

এদেশে পাশ্চাত্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। হিন্দু কলেজের (১৮১৭) ছাত্ররা পাশ্চাত্যের প্রভাবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। ফলে সমাজের রক্ষণশীল অংশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়। বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে কলেজের ছাত্ররা বিদেশী সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে গ্রহণ করে। এতে দেশের সমাজ জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

স্বাধীন চিন্তা-শক্তিই হচ্ছে উন্নতির চরম কথা। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্বাধীন চিন্তার প্রাবল্য ছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার স্পর্শে সে স্বাধীন চিন্তার উৎস ভূমি বিনষ্ট হয়ে গেছে। 'প্রবন্ধ-মালা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ

> "পূর্ব্বে অন্ততঃ আরণ্যক মুনি-ঋষিদের মধ্যে স্বাধীন-চিন্তা পাখা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, -এখন একদিকে ইউরোপীয় পরাক্রমের গুরুভার এবং আর একদিকে ভ্রষ্ট হিন্দুয়ানি রূপী মৃত ঘটোৎকচের গুরুভার-দুই দিক্ দিয়া দুই ভাব আসিয়া আমাদের দেশের স্বাধীন-চিন্তাকে যাঁতায় পিসিয়া বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে।"[১৮]

বাংলার মানুষ যদি ইউরোপীয় আচার-আচরণ বর্জন করে মনে-প্রাণে স্বদেশী ভাবাপন্ন হ'ন এবং ইউরোপীয় ভাল দিকগুলি গ্রহণ করেন তাহলেই

---

১৮ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ-মালা (শান্তি নিকেতন ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২৭), পৃষ্ঠা ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ তথা দেশের মঙ্গল সাধিত হবে। মোটকথা, জাতীয় ভাব রক্ষা করে বিজাতীয় ভাবকে পরিহার করাই হচ্ছে সমাজের মঙ্গল সাধনের সর্বোত্তম উপায়।

মানুষের ভেতরে দু'টি ভাবের প্রস্রবণ সতত প্রবহমান; কাল্পনিক ও বাস্তববাদী ভাবের মধ্যে কাল্পনিক ভাবের লোকেরা সব সময়ই অন্যদের অনুকরণ করে থাকেন। বাঙালী সমাজে এই অনুকরণপ্রিয়তার প্রার্দুভাব সবচেয়ে বেশী। অন্যের অনুরকণ করে কোন ক্ষেত্রেই উন্নতিলাভ করা যায় না। 'প্রবন্ধ-মালা'য় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

> "সেক্সপিয়ারের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী নাটক লিখিলে বাঙ্গালী সেক্সপিয়ার হওয়া যায়। মিল্‌টনের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী মহাকাব্য লিখিলে বাঙ্গালী মিল্‌টন হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার সহজ উপায় যেমন অনুকরণ এমন আর কিছুই নহে।"[১৯]

ইংরেজ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ থেকে বাঙালী সমাজ দিন দিন বিদেশীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। সমাজের সকল কাজের দায়-দায়িত্ব সরকারের উপর চাপিয় দিয়ে তারা ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে। একসময় দেশের বিত্তশালী ও সমাজ হিতৈষীগণ সমাজের ছোটখাট কাজে নিজেরাই অংশ নিতেন। তারা তখন রাজার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তেন না। কিন্তু বর্তমানে সমাজের ছোট-বড় সকল কাজেই রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার লক্ষণ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।[২০] পরিশ্রম ব্যতিরেক পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে মুক্ত হবার পথ নেই। সমাজের প্রতিটি মানুষ পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে জাতীয় উন্নতির পথকে প্রশস্ত করে তুলতে পারেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি পরিশ্রমের ভেতর দিয়েই উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। লুত্‌ফর রহমান 'মানব-জীবন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

---

[১৯] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭।

[২০] সংকলন ঃ স্বদেশী সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

"যুবক সম্প্রদায়কে বলি, লেখাপড়া শিখে সর্বপ্রকার হীনতাকে উপহাস ক'রে তোমরা তোমাদের দুইখানি হাতকে নমস্কার ক'রে নাও। তোমাদের ভিতর যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে ভাড়া না দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের এবং জাতির মঙ্গলের পথে নিযুক্ত কর; সকল দেশের সকল জাতির মুক্তির পথই এই।"[২১]

পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাল ভাল কাজ হয়েছে, তা' কঠিন পরিশ্রম; ত্যাগ ও দুঃখের ভেতর দিয়েই। ইংরেজগণও এক সময় প্রচন্ড পরিশ্রমের ভেতর দিয়েই আজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মতো পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করলে বাঙালী জাতিও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হবে।

পরনির্ভরশীলতার নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্ত হতে হলে ধর্মীয় সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সমাজের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র সমাজের গন্ডী পেরিয়ে বিশ্ব সমাজের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে ও ভাল-মন্দের অংশীদার হতে হবে। তাছাড়া গ্রামের অবহেলিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পাড়লেই সমাজ তথা দেশের মঙ্গল সাধিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ

"ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব আছে তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে; অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।"[২২]

---

[২১] মানব-জীবন, আবদুল কাদির সম্পাদিত, লুত্‌ফর রহমান রচনাবলী, প্রথম খন্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ১৫৩।

[২২] সংকলন ঃ সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রম ব্যতিরেক দেশ ও সমাজের কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব নয়; তেমনি অলসতা জাতিকে পঙ্গু করে দেয়। আর জাতির এই পঙ্গুত্বই হচ্ছে পরনির্ভরশীলতা। জাতিকে পরনির্ভরশীলতার হাত হতে রক্ষা করতে হলে তাদের মনুষ্যত্ব ও প্রাণ শক্তির জাগরণ ঘটাতে হবে। 'মহৎ-জীবন' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "যে জাতির মানুষ শ্রমশীল, যারা জ্ঞান-সাধনায় আনন্দ অনুভব করে, তারাই জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। জগতে ধন-সম্পদ জয় করতে হ'লে, জীবনের কল্যাণ লাভ করতে হ'লে, পরিশ্রম ও সাধনা চাই।"[২৩]

ছয়

মানবিক মূল্যবোধ

প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' (১৯২৬); ডাক্তার মোহাম্মদ লুত্ফর রহমানের 'মহৎ-জীবন' (১৩৩৩), 'মানব-জীবন' (১৩৩৪) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রী' (১৩৩৬) গ্রন্থে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা আছে।

বর্তমান সমাজে মানবিক মূল্যবোধের প্রচন্ড রকমের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব, জাতিতে-জাতিতে দ্বন্দ্ব এই মানবিকতার অভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের কৃত কর্মের অপরাধ থেকে সৃষ্ট পাপ মানব সমাজকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে সমাজের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ছে। মানব সমাজকে এই পাপ পথ থেকে বিরত রাখতে যুগে যুগে মহামানবগণ তাঁদের স্নেহ ও কল্যাণের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষ আত্ম সুখের বশবর্তী হয়েই মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিচ্ছে। 'মহৎ-জীবন' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

---

[২৩] মহৎ-জীবন, আবদুল কাদির সম্পাদিত, লুত্ফর রহমান রচনাবলী, প্রথম খন্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭২), পৃষ্ঠা ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

"এ-জগতে মানুষ নিজের সুখের জন্য কত লালায়িত, মানুষের জন্য মানুষের সহানুভূতি ও বেদনা-বোধ কত সুন্দর, কত মহৎ,-মানুষ তা কবে বুঝবে? প্রকৃত সুখ কোথায়? পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সুখটুকু ভাগ ক'রে দেওয়াতে কি সত্যিকারের সুখ আছে ? আত্মার সাত্ত্বিক তৃপ্তির কাছে জড় দেহের ভোগ-সুখের মূল্য কিছুই না। যতদিন না মানুষ পরকে সুখ দিতে আনন্দ বোধ করবে, ততদিন তার যথার্থ কল্যাণ নাই।"[২৪]

জাতির মধ্যে যখন বড় চরিত্র ও উন্নত জীবনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখনই জাতির জীবনে দুরবস্থা নেমে আসে। উন্নত চরিত্র ও হৃদয়বান ব্যক্তি ছাড়া জাতির দেহে শক্তি সঞ্চার হয় না। জাতির মজ্জায় যখন মহত্ত্বের শক্তি সঞ্চারিত হয় তখনই জাতি একে অরপকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শেখে, -শেখে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। মানুষ কখনো কখনো মহৎ প্রাণ ব্যক্তিত্বকে স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত করে প্রকারন্তরে তাঁদেরকে অসম্মানই করেন। এ প্রসঙ্গে লুত্ফর রহমান তাঁর 'মহৎ-জীবন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"মানুষ যখন মহামানবতার পরিচয় দেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে খোদার আসন দিয়ে থাকে। এতে মহামানুষদিগকে অপমান করা হয়। নারায়ণ হ'য়ে মহাপুরুষদের মোটেই তৃপ্তি হয় না, -তাঁরা চান-মানব-দুঃখের অবসান, অসত্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধে মানব-সমাজের বিদ্রোহ।"[২৫]

জ্ঞান অর্জন ব্যতীত মানুষের কল্যাণ পরিপূর্ণতা পায় না। জীবনের প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়-মহত্ত্বের ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়ে। মহৎ ব্যক্তি দেবতা ও পাপীকে সমান চোখে দেখেন। আর এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। মানুষের অন্তরে মনুষ্যত্ববোধ না জন্মালে তা পশুত্বের সমপর্যায়ে পর্যবসিত হয়। মনুষ্যত্ব

---

[২৪] ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮।

[২৫] ঐ, পৃষ্ঠা ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

বোধের অভাবে মানুষ ক্রুর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ভেতর দিয়ে অমানুষে পরিণত হয়। 'মানব-জীবন' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "মানুষ যখন মানুষের উপর অত্যাচার ক'রে, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে, মানুষকে চূর্ণ ক'রে, মানুষকে ব্যথা দেয়, মানুষ যখন অপ্রেমিক, নিষ্ঠুর, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, নীচ, আত্মমর্যাদা-জ্ঞানহীন, নিন্দুক এবং বিশ্বাস ঘাতক হয়, যখন সে মোনাফেক, শয়তান এবং ক্রুর হয়, সে যতই উচ্চাসন লাভ করুক, সে পশু। সে আর তখন মানুষ থাকে না।"[২৬]

যে ব্যক্তি দুঃখী-পীড়িতের ব্যথা মর্মে অনুভব করে সেবার কাজে আত্মদান করেন, তিনি মানুষের গৌরব। তিনি মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে পীড়িতের মধ্যে যান, দরিদ্রের সেবা করেন এবং দুঃখীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। সেবাই তার কাছে পরম ধর্ম।

মানুষ-মানুষের কথা ভাববে, মানুষের বিপদে-আপদে তাদের পাশে থাকবে, এই তো স্বাভাবিক মনুষ্যজনিত কাজ। কিন্তু এই মনুষ্যত্বকে বর্জন করে তারা যখন দানবত্বকে গ্রহণ করে তখনই মানুষের অমঙ্গল সূচীত হয়। মানব-সমাজে ভাল-মন্দ দু'টি দিকই আছে। কিন্তু তাতে ক'রে মানবতাবোধ সংসার থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে মানবতাবিরোধী শক্তির প্রাধান্যই বর্তমান সমাজে বেশী। পশুশক্তির দাপটে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ আজ ভূলুণ্ঠিত। তবু এর ভেতরেই মাঝে-মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে কিছু মানুষের আবির্ভাব হচ্ছে। এই পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষকে পরিত্রাণ করার জন্য তাঁরা তাঁদের কল্যাণের হাত প্রসারিত করে দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

---

[২৬] মানব-জীবন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

"তখনো মানুষ শিশুর নবজন্ম নিয়ে সত্যের মুক্তিরাজ্যে সহজে সঞ্চরণ করবার অবকাশ ও অধিকার হারায় নি। এই জন্যেই আকবরের মতো সম্রাটের আবির্ভাব তখন সম্ভবপর হয়েছিল, এই জন্যেই যখন ভ্রাতৃরক্তপঙ্কিল পথে আওরংজেব গোঁড়ামির কঠোর শাসন বিস্তার করেছিলেন তখন তাঁরই ভাই দারাশিকো সংস্কার বর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তখন বড়ো দুঃখের দিনেও মানুষের পথ ছিল সহজ। আজ সে-পথ বড়ো দুর্গম।"[২৭]

মানবিক মূল্যবোধের অভাবে সমাজে দরিদ্র লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। রাজার দায়িত্ব রাজা ঠিকমতো পালন না করে গরীবের দুঃখকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। জমিদারও তার প্রজাকে জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে চলছে। এবং সেই সাথে প্রজার উপর তার অত্যাচারের হাতকে আরো প্রসারিত করে দিচ্ছে। এভাবেই একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। অন্যদিকে ব্রিটিশের গাফিলতির কারণে বাংলাদেশে ছেয়াত্তরের মন্বন্তরে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। এখানে মানবতার পরাজয় আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> "১৭৬৯ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে (বাংলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাংলায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহাশ্মশানে পরিণত হল, তখন কোম্পানির বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল।"[২৮]

---

[২৭] যাত্রী, রবীন্দ্র রচনাবলী, উনিশ খন্ড (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৪২৬।

[২৮] রায়তের কথা, প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড (কলকাতা ঃ ১৯৫৪), পৃষ্ঠা ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সাত

বাংলার কৃষক সমাজ

আবুল হুসেনের 'বাংলার বল্‌শী' (১৩৩২); প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' (১৯২৬) এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'রূপক ও রহস্য' (১৩৩০) গ্রন্থে বাংলার কৃষক সমাজের কথা বলা হয়েছে।

অতীত কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার কৃষক সমাজের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। অতীতে জমিদার ও ভূস্বামীগণ কৃষকদের জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করেছে। সেই সাথে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে যেয়ে ইংরেজ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ব্যবস্থা করে প্রজাদের বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্ব কেড়ে নেয়। এভাবেই কৃষকের ভাগ্যে নেমে আসে অন্ধকার। তারা দু'মুঠো অন্নের জন্য সারা বছর অবিশ্রামভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে করে তাদের অন্নের অভাব দূর না হয়ে ক্রমেই তা বেড়ে যাচ্ছে। কৃষকদের সন্তানরাও একটু বড় হতে না হতেই একঘেয়ে জীবনের সকল যন্ত্রণা ও পরিতাপের অংশীদার হচ্ছে। অবিরাম জীবনযুদ্ধে তারা বিপর্যস্ত। দুর্বল চাষীদের উপর সমাজের ধনিক সম্প্রদায় ও জমিদারগণ ক্রমাগত অত্যাচার করে চলছে। 'বাংলার বল্‌শী' প্রবন্ধে আবুল হুসেন বলেছেন ঃ

> "জমিদার চাষাকে খাটাচ্ছে কিন্তু কৈ তার যে জমি তা মেরামত করতে দেখছি না। জমি আর কত পারে ? জমির ওপর পড়ে চাষা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাঁটছে-সারা বৎসরের খাটুনির ফল সংগ্রহ করে ঘরে তুল্‌তে না তুল্‌তে জমিদারের পেয়াদা বা সেপাহীর হাঁক এসে তার জানের রক্ত পানি ক'রে দিচ্ছে।"[২৯]

---

[২৯] আবুল হুসেন, বাংলার বল্‌শী (ঢাকা ঃ 'তরুণ পত্র' কার্যালয়, ১৩৩২), পৃষ্ঠা ৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে কৃষি জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষকরা বাধ্য হয়ে অনাবাদী জমিকেও আবাদী জমিতে পরিণত করছে। অপরদিকে জমিদার-জোতদারগণ তাদের জমির পরিমাণ বাড়াতে কৃষকের জমির উপর হস্তক্ষেপ করছে। তারা যে গরু দিয়ে জমি চাষ করতো, আজ সে সব গরু অসুখে মারা যাচ্ছে। এতে সাধারণ কৃষকদের উপর নেমে আসছে অন্ধকার। পশুচিকিৎসার অভাব গ্রামে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। চাষীরা জমি চাষ করতে যেয়ে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকার যদিও কৃষকদের মঙ্গলের জন্য সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজ-শর্তে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু সে ঋণের টাকা গ্রামের সাধারণ কৃষকের কাছে পৌঁছতে পারে না। গ্রামীণ মহাজনদের মতো এখানেও সরকারের নব্য মহজন তৈরী হওয়ায় সরকারী টাকা নিয়ে কৃষকরা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে।

চাষীরা ঋণের টাকা পরিশোধ করতে যেয়ে ঘরের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে। অন্যদিকে জোতদার ও জমিদাররা জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ফলে শষ্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ না হওয়ায় একদিকে ফসলের উৎপাদন যেমন কমে যাচ্ছে, তেমনি কৃষকদের পরিশ্রমও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। দেশের কৃষি সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারা কৃষকদের দিকে সুনজর না দেয়ায় কৃষি সম্পদ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে। এভাবেই বাংলার কৃষক সমাজ একের পর এক দুর্ভোগ মাথায় নিয়ে বেঁচে আছে।

বাংলার চাষীরা আজ গ্রামের আঁধারে বসে থেকে ধুকে ধুকে মরছে। শিক্ষার আলো তাদের দোর গোড়ায় পৌঁছেনি। অভাব-অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী। অন্যদিকে তাদের ক্ষেতের আল দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে। এজন্য তাদেরকে আদালত পর্যন্ত যেতে হচ্ছে। ক্ষেতের মালিকদের পরামর্শে সাধারণ চাষীরা এতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। কারণ, বেশীর ভাগ কৃষকই ভূমিহীন। ফলে তাদেরকে মহাজন-ভূস্বামীদের কথা মতো চলতে হচ্ছে। দেশের সরকার ও রাজনৈতিক নেতারা কৃষকদের এহেন পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসেননি। সরকার

Dhaka University Institutional Repository

যদি কৃষকদের উন্নতির জন্য এগিয়ে আসতেন এবং জমির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো তবে দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হতো। দেশ শষ্য ভান্ডারে ভরে যেতো। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন ঃ

> "প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে স্বত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান রাশিয়া।"[৩০]

আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে যেয়ে বাংলাদেশেও অসংখ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান চাষের জমির উপরই তৈরী হচ্ছে। এতে সাধারণ কৃষকরা জমি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ছে। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের উন্নতি ঘটাতে হলে কৃষি এবং কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। কৃষি প্রধান এদেশে সর্বাগ্রে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে না পারলে দেশের উন্নতি সাধন কখনোই সম্ভবপর হবেনা। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে -

> "বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান ছেরেপ জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয়, তা হলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"[৩১]

গ্রামীণ সমাজ জীবনে কৃষকদের এহেন দুর্দশার মধ্যেও তাদের ভেতরে বারো মাসে তের পার্বণের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বিভিন্ন উৎসবের ভেতর দিয়ে তারা আনন্দের অংশীদার হয়। সমাজের ধনিক সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের আয়োজন করে। এতে তারা গ্রামের কৃষক-শ্রমিককেও

---

[৩০] রায়তের কথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৫।

[৩১] ঐ, পৃষ্ঠা ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ত করে। গরীবের রক্ত শোষণকারী ধনিক সম্প্রদায় উৎসবের পর-পরই আবার তারা কৃষক-শ্রমিকের রক্ত দ্বিগুণ হারে শোষণ করতে থাকে। 'রূপক ও রহস্য' গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন ঃ

> "দুর্গা দশ হাতে সর্ব্বস্ব খাইয়া লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান। কেবল খালি কাঠামো পড়িয়া থাকে।"[৩২]

বাংলার সমাজ জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যা এদেশের মানুষকে অতীত মুখী করেছে। সেই সাথে দেশের সমাজ জীবনে নারী স্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধ, মানসিক উৎকর্ষ বা যৌবনধর্মের অনগ্রসরতা লক্ষণীয়। দেশের কৃষক সমাজের করুণ অবস্থার পাশাপাশি বিদেশী শাসন-শোষণ বাংলার মানুষকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করেছে। ফলে মানুষের মন স্বদেশাভিমুখী না হয়ে পাশ্চাত্যমুখী হচ্ছে; এবং সমাজ পরনির্ভরশীল হয়ে পঙ্গুত্বকে বরণ করে নিচ্ছে।

---

[৩২] অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রূপক ও রহস্য (চুঁচুড়া, ১৩৩০), পৃষ্ঠা ৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

আলোচ্য দশকে রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া আরও কয়টি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া, সামাজিক অবক্ষয়রোধ, ধর্মীয় কুসংস্কার পরিহার ও প্রকৃত শিক্ষার মধ্যদিয়ে মানবিক উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি প্রেম, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়েও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। বিবিধ প্রবন্ধ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

১. কাজী আবদুল ওদুদ, নবপর্যায়, প্রথম খন্ড (১৩৩৩); দ্বিতীয় খন্ড (১৩৩৬)
২. জগদীশচন্দ্র বসু, অব্যক্ত (১৩২৮)
৩. নলিনীকান্ত গুপ্ত, শিক্ষা ও দীক্ষা (১৯২৮)
৪. প্রমথ চৌধুরী, আমাদের শিক্ষা (১৩২৭)
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন (১৩৩২); যাত্রী (১৩৩৬)
৬. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিচিত্র জগৎ (১৯২০); জগৎ কথা (১৯২৬)
৭. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমের কথা (১৩২৭); সখী (১৩২৮)

দুই

প্রেম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যাত্রী' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৮-১৯২৯) দু'টি বইয়ে প্রেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে প্রেমের দু'টি ধারার কথা ব্যক্ত করেছেনঃ ভালোলাগা আর ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি,

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসায় ত্যাগের সাধনা। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এ দুই জাতের প্রেম দৃশ্যমান। একটিতে সন্তানের প্রতি অন্ধ স্নেহ এবং অন্যটিতে আসক্তি। প্রকৃত প্রেম মানুষকে ত্যাগের মধ্যদিয়ে মুক্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু যদি তা ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে প্রেম নয়- রিপু।[১]

এ বিশ্ব সংসারে সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হচ্ছে প্রেম। আর এর প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে নারী। নারীকে কেন্দ্র করেই প্রেম বিভিন্ন রূপে আবর্তিত হয়। সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর-প্রেমের এ চারটি লক্ষণের কথা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রেম কখনো ঈশ্বরাভিমুখী আবার কখনো জাগতিক।

নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণ শক্তিতে জাগিয়ে তুলতে পারে; কিন্তু সে প্রেমে যদি ভোগের কালিমা না থাকে। অন্যদিকে পুরুষের আত্মবিকাশের তপস্যাকে মুহূর্তেই ভূ-লুণ্ঠিত করতে পারে নারীর ভোগরূপী প্রেম।

প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের জন্মগত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। প্রকৃতি চায় পুরুষকে সাধনার পথ থেকে বিচ্যুৎ করতে। পুরুষও প্রকৃতির এই বিরুদ্ধাচরণের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে জ্ঞান-সাধনার ভেতর দিয়ে অসীমের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সদাই সচেষ্ট।[২]

প্রেম শুধু হৃদয়ের ভাব নয়, তা হলো এক ধরনের শক্তি। নারী শক্তিতে মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন নিহিত রয়েছে। নারীর প্রেম পুরুষকে কল্যাণ ও আনন্দের পথে যেমন করে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি ভাবে আবার তা বিশ্ব শক্তিকেও নাড়া দেয়। নারীর প্রেম পুরুষের মনে শুধু তৃপ্তিই আনে না, তাকে শক্তি যোগায় এবং সেই সাথে সৃষ্টিকে অসামান্য রূপে উদ্‌ঘাটিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যাত্রী' গ্রন্থে- বলেছেন ঃ

---

[১] যাত্রী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯ খন্ড (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৪২০।

[২] ঐ, পৃষ্ঠা ৪২১।

382690

Dhaka University Institutional Repository

"এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে তা নয়, তাকে বল দেয়, তার সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে থাকে।"[৩]

নারীর প্রেম পুরুষকে প্রত্যক্ষরূপে পেতে চায়। পুরুষকে নানা প্রকারে বেষ্টন করার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানের ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সহ্য করতে পারে না। অভিসারের পথ যত দুর্গমই হোক না কেন, এ দুর্গম পথকে অতিক্রান্ত করার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ জন্যেই সাধারণত পুরুষ, নারীর এ নিবিড় সঙ্গ বন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পালাতে চেষ্টা করে। নারীর জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হচ্ছে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধন ঘুচিয়ে দেয়; বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এজন্যই প্রাণোচ্ছল পুরুষ নারীর প্রেমকে পরিপূর্ণরূপে পায়।[৪]

প্রেমের ক্ষেত্রে দূতীর কাজ করার জন্য সখীর প্রয়োজন হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য এমনকি পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমলীলায় সখীর প্রাধান্য লক্ষণীয়। সখী প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের ক্ষেত্রেই শুধু সহায়তা করেন না, তাদের বিপদ-আপদেও সাহায্য করেন। এ প্রসঙ্গে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সখী' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"সংসারের ছোট বড় সকল সুখ দুঃখেই সখী সম বেদনাময়ী ও বিশ্বাস পাত্রী। এইরূপ সমদুঃখ সুখা সম বয়স্কা প্রতিবেশিনী সুখের সময় রঙ্গব্যঙ্গ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, আবার দুঃখে সান্ত্বনা ও সৎ পরামর্শ দেন, অসময়ে সাহায্য ও শুশ্রূষা করেন, পতি পত্নীতে মনোমালিন্য ঘটিলে নারী সুলভ উপায়ে প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন।"[৫]

---

[৩] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮১।

[৪] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৫।

[৫] ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সখী (কলকাতা ঃ ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, ১৩২৮), পৃষ্ঠা ৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিচ্ছেদের ভেতর দিয়েই শক্তি কাজ করার ক্ষেত্র পায়। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে একটা দূরত্ব আছে। এই দূরত্বের ফাঁকটা কেবলই সেবায়-ক্ষমায়-বীর্যে-সৌন্দর্যে-কল্যাণে ভরে ওঠে। তাইতো নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের গান। অনুরাগের সত্যশক্তি সব মেয়ের যেমন নেই, তেমনি বৈরাগ্যের সত্য শক্তিও সব পুরুষে মেলে না।[৬]

পুরুষ সব সময় একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। পুরুষের এই সম্পূর্ণতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো নারীকে ভালোবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখন্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষ নারীর ভালোবাসার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে আনন্দ পেতে চায়। পুরুষের কাব্যে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়।[৭]

প্রকৃতির ভেতরে নারী একটা স্থায়ী জায়গা করে নিতে পেরেছে। পুরুষ তা পারেনি বলেই পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজে বেড়াতে হয়। যদিও সে নতুনের সন্ধান পাচ্ছে, কিন্তু চরমের আহ্বান তাকে থামতে দিচ্ছে না। সে কারণেই পুরুষের সঙ্গে নারীর একটা ব্যবধান জন্মগত ভাবেই তৈরী হয়ে থাকে। 'যাত্রী' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "পুরুষের পক্ষে মেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দূরত্ব নিয়ে আসে; তার মধ্যে খানিকটা পরিমাণে নিষেধ আছে, ঢাকা আছে।"[৮]

প্রেমের বিচিত্র রূপের প্রকাশ বিচিত্র ভাবেই পৃথিবীতে ঘটে থাকে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ভেতর দিয়েই প্রেমের সঞ্চার হয়। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েদের সামাজিক অবরোধ প্রথা না থাকায় প্রেমের সঞ্চার পূর্ণ রূপেই প্রকাশ

---

[৬] যাত্রী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮৪।

[৭] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৬।

[৮] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

পায়। সেকালে হিন্দু সমাজে অবরোধ প্রথার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। ফলে বিভিন্ন উৎসবের সময় নর-নারীর দর্শন লাভের মধ্যদিয়ে প্রেমের সূত্রপাত ঘটতো।

সংস্কৃত সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে নর-নারীর প্রণয়ের চিত্র আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও প্রেমের অকালপক্বতার ছড়াছড়ি। এ প্রেমের সঞ্চার বিভিন্ন ভাবে ঘটতে পারে; পরস্পর-পরস্পরকে দেখে কিংবা বিপদের দিনে সাহচর্যের হাত বাড়িয়ে অথবা সেবা শুশ্রূষার মধ্যদিয়ে।[৯]

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যদিও গান্ধর্ব-বিয়ের প্রচলন ছিল; কিন্তু জাত বা গোত্র বিচার করে পাত্র নির্বাচনের নীতি প্রচলিত ছিল। এবিয়েতে যুবক-যুবতী নিজ ইচ্ছায় বিয়ে করতে পারতেন, এবং অভিভাবকগণ তা মেনেও নিতেন। কিন্তু পাত্রী জাতবিচার করে প্রণয় পাত্র নির্বাচন করতো।[১০]

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রেমের ক্ষেত্রে জাতের বিচার মুখ্য নয়। ভাললাগাটাই হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু যে সমাজে প্রেমের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই, অসবর্ণ বিয়ে বা গান্ধর্ব বিয়ের স্থান নেই, বর নির্বাচনে মেয়ের স্বাধীনতা নেই, সেখানে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রেমের ফল্গু উড়িয়ে সমাজের অমঙ্গল সাধন করা হচ্ছে।[১১]

আধুনিক সমাজ জীবনে প্রেম ছোঁয়াচে রোগের ন্যায় সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। এ অবস্থা থেকে কারো নিস্তার নেই বলে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রেমের কথা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

---

[৯] ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমের কথা (কলকাতা ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩২৭), পৃষ্ঠা ৬৭।

[১০] ঐ, পৃষ্ঠা ১০৭।

[১১] ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

"অন্তঃপুরে, রোগ-শয্যায়, হাঁসপাতালে, গৃহের ছাদে, স্নান ঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে, গঙ্গা স্নানের যোগে, কোথাও গৃহস্থ কন্যা প্রেমিকের শ্যেন দৃষ্টি হইতে নিরাপদ্ নহে। ডাক্তার, মাষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বা পড়ুয়া ছাত্র, প্রেমের ব্যাসিলাস্ হইতে কাহারও নিস্তার নাই।"[১২]

তিন

মনস্তত্ত্ব

মনস্তত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সংকলন' ও 'যাত্রী'র বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। কারো মনের যথার্থ অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণই মনস্তত্ত্ব। শিশুর মধ্যে মানুষের প্রাণময় রূপটি স্বচ্ছ এবং সুপ্রত্যক্ষ। শিশুর আত্মপ্রকাশে কোনরূপ কৃত্রিম সংস্কার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। তার মধ্যে মুক্তির সহজ ছবি দেখা যায়। আর প্রকাশের পূর্ণতাই হচ্ছে মুক্তি।

সৃষ্টির মধ্য দিয়েই স্রষ্টা তাঁর লীলার প্রকাশ করেন। সৃষ্টির সকল সৌন্দর্যের মধ্যেই লীলার প্রকাশ বেশী। সৃষ্টির আনন্দে স্রষ্টাও আনন্দিত। মানব তার মন ও প্রাণকে একাত্ম করে এই আনন্দ অংশীদারের ভাগী হ'ন। স্রষ্টার এই লীলা ভূমিতে রূপের খেলা দেখে মানুষের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে; একেবারে পৌঁছয় আনন্দে।[১৩]

স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য সৃষ্টি সদাই উন্মুখ। সৃষ্টির সেরা মানুষ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য মনকে প্রাণের সঙ্গে যোগ করতে যেয়ে পথে পথে বিভিন্ন রিপুর দ্বারা বাঁধাগ্রস্থ হয় এবং পরিশেষে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। কিন্তু মনের একাগ্রতা ও উদ্যমের কাছে রিপু পরাস্ত হয়। 'যাত্রী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

---

[১২] ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৭।

[১৩] যাত্রী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

"প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধুলিরাগে রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না।"[১৪]

মানুষ কেবল-যে আত্মরক্ষা করবে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। প্রতি নিয়তই জীবনকে মৃত্যু নবীন করছে। যার সঙ্গে মানুষ ঘর-কন্না পেতে বসেছিল, একসময় সে বুঝতে পারে সব কিছুই মিথ্যা ও রহস্যময়।[১৫]

মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে সত্য। অনন্তকাল ধরে এ পথে পথিক ছুটে চলছে। এ ছুটে চলা হচ্ছে এক সত্য থেকে আরেক সত্যে পৌঁছা। এই ছুটে চলার পথেই মানুষকে তার স্ব-স্ব কর্মের স্বাক্ষর রেখে যেতে হচ্ছে।[১৬]

অন্যদিকে, মানুষের আত্মা যখন দেহ ছেড়ে অনন্তের মাঝে মিলিয়ে যায়, তখন দেহ বা কায়া অনুতাপে জর্জরিত হয়। যাকে সে ভালোবাসা দিয়ে, মায়া-মমতা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল, তাকেই আজ জড়পিন্ডের ন্যায় ফেলে যেতে হচ্ছে।[১৭]

মানব মন কখনো কখনো স্থূল জগৎ ছেড়ে সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করে। জাগতিক ভোগ-বিলাস তখন তার কাছে অতি তুচ্ছ মনে হয়। মন তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে তার এ ধরা ধামে আগমন সম্পর্কে। কোথা থেকে সে এসেছে এবং পরে আবার কোথায় যাবে। কিন্তু এ প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না।[১৮]

---

১৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৪০৫।

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন ঃ পাগল (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৮৬), পৃষ্ঠা ১৭৭।

১৬ সংকলন ঃ পায়ে-চলার পথ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৩।

১৭ সংকলন ঃ কাব্যের তাৎপর্য, ঐ, পৃষ্ঠা ১৫১।

১৮ সংকলন ঃ মন, ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

চার

বিজ্ঞান

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা কম। তবে এই দশকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক হচ্ছে- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বিচিত্র-জগৎ'; 'জগৎ-কথা' এবং জগদীশচন্দ্র বসুর (১৮৫৯-১৯৩৭) 'অব্যক্ত'। 'বিচিত্র-জগৎ' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জগতের উদ্ভব ও প্রাণের আবির্ভাবকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া তিনি এ কথাও বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একদিন আসবে, যখন প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভবপর হবে। সমুদয় প্রাণি-পদার্থ আবার প্রাণহীন জড়ে পরিণত হবে। মৃত্যু এসে সমস্ত প্রাণকে লুপ্ত করে দেবে। প্রাণের আবির্ভাবকে অনেক পন্ডিত ব্যক্তি বিধাতার দান বলে মেনে নিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে প্রাণের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "প্রোটোপ্লাজমই জড় জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে হজম করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া নূতন প্রোটোপ্লাজম্, তৈয়ার করিতেছে; তাহাতে প্রাণের ধারা অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে।"[১৯]

প্রোটোপ্লাজম থেকে প্রাণের উৎপত্তি। কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম বিজ্ঞানাগারে তৈরী করে কখনও প্রাণহীন জড়ে প্রাণের সঞ্চার করা সম্ভব নয়।[২০]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগৎ হচ্ছে বিচিত্র জগৎ। বিজ্ঞান যাকে জড় জগৎ বলে, তা প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ নয়, বাহ্য জগতের কল্পিত বাঙ্ময় প্রতিমা মাত্র। বাহ্য

---

১৯ বিচিত্র-জগৎ, রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র, তৃতীয় খন্ড, ডঃ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত (কলকাতা ঃ গ্রন্থমেলা, ১৩৮৪), পৃষ্ঠা ৩৫৪।

২০ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

জগতের এই কল্পিত প্রতিমাই বৈজ্ঞানিকদের জড় জগৎ। এ মহাবিশ্বে দু'ধরনের জগতের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ ব্যাবহারিক জগৎ ও প্রাতিভাসিক বা প্রত্যক্ষ জগৎ। সাধারণ মানুষ ব্যাবহারিক জগৎকেই মেনে নিয়েছেন।[২১]

বিচিত্র এ জগতে জড় দেহের মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যেয়ে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু লক্ষ্য করেছেন যে, প্রাণিদেহ ও জড়দেহের মধ্যে উত্তেজনার সঙ্গে চাঞ্চল্য ও অবসাদের সৃষ্টি হয়। এবং অধিক চাঞ্চল্য অবসাদে পরিণত হয়। অধিক অবসাদে মৃত্যু উপস্থিত হয়। উদ্ভিদেরও তদ্রূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বিচিত্র-জগৎ' গ্রন্থে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> "বাহিরের উত্তেজনায় জন্তুর দেহে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বাহির হইতে ডাক পড়িলে জন্তুদেহ সাড়া দেয়। উত্তেজনার মাত্রাধিক্যে চাঞ্চল্য অবসাদে পরিণত হয়; অধিক অবসাদে মৃত্যু আনে। আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদের দেহেরও ঠিক এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা আছে। উত্তেজনার ফলে চাঞ্চল্য; মাত্রাধিক্যে অবসাদ, অবশেষে মৃত্যু; - উদ্ভিদেরও এই সকল আছে।"[২২]

প্রাণের সঙ্গে জড়ের একটা বিরোধ আছে। প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ হ'ল নিজেকে বৃদ্ধি করা। প্রাণ এ জগতে থাকতে চায়, টিকতে চায় এবং আপনাকে বৃদ্ধি ও প্রসারিত করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে চায়। প্রাণ সমস্ত জড় জগৎকে হজম করে, আত্মসাৎ করে এই প্রাণি পদার্থে পরিণত করতে চায়; সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করে একটা প্রাণময় জগতে পরিণত করতে চায়। জড়ও তেমনি অবিরাম প্রাণি-পদার্থকে জড় পদার্থে পরিণত করতে চাচ্ছে। উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা যুদ্ধ চলছে। একদিকে জড় পদার্থের উপাদেয় অংশ প্রাণের কবলে এসে নতুন প্রাণি-পদার্থ উৎপাদন করছে। অন্যদিকে

---

[২১] ঐ, পৃষ্ঠা ২৬৮।

[২২] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

জড়ের চেষ্টায় প্রাণি-পদার্থ সর্বদা জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। এই বিরোধের ধারাই প্রাণের প্রবাহ। প্রাণি-পদার্থের জড়ত্বে পরিণতির নামান্তর মৃত্যু; এই মৃত্যুই প্রাণের পরাজয়। এ প্রসঙ্গে 'বিচিত্র-জগৎ' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> "এই বিরোধের যে দিন সমাপ্তি হয়, সেই দিন মৃত্যু। প্রাণীর পক্ষে এই মৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী, জড়ের নিকট পরাজয়টাই অবশ্যম্ভাবী।"[২৩]

জগদীশচন্দ্র বসু 'অব্যক্ত' গ্রন্থে বলেছেন যে, মহাশক্তির প্রভাবেই এ বিশ্ব জগৎ অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং জীবনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি। শক্তি আদিম জীব বিন্দুকে মনুষ্যে উন্নীত করেছে, যার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূণ্য হতে এ বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হয়েছে, আজও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। মহাশক্তির প্রভাবেই মানব দানবত্ব পরিহার করে দেবত্বে উন্নীত হবে।[২৪]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'জগৎ-কথা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুর সংমিশ্রণে জড় পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। কণাদ মুনির দর্শন শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যাবতীয় জড় পদার্থ পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। কিন্তু উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বের কথা তাঁরা জানতেন না। এ নিয়ম নব্য রাসায়নিক পন্ডিতদের আবিষ্কৃত।[২৫]

সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তন বেগে ঘুরার কথা 'জগৎ-কথা' গ্রন্থে বলা হয়েছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তন বেগে ঘুরার ফলে পৃথিবীর আবর্তন বেগ ক্রমশ কমছে। পৃথিবীর আবর্তন বেগ কমতে কমতে এমন এক সময় আসবে যখন একমাসে একদিন রাত হবে। এবং সেই সাথে চাঁদেরও শক্তিক্ষয় হয়ে পৃথিবীর সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়বে।[২৬]

---

[২৩] ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

[২৪] জগদীশচন্দ্র বসু, অব্যক্ত (কলকাতা ঃ বাউল মন প্রকাশন, ১৯৯৪), পৃষ্ঠা ৮৭।

[২৫] জগৎ-কথা, রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, ডঃ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত (কলকাতাঃ গ্রন্থমেলা, ১৩৮৬), পৃষ্ঠা ২০৫।

[২৬] ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ

শিক্ষা

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করে প্রমথ চৌধুরী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দেশের শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথ চৌধুরী অভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমগ্র দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটানো সম্ভব। বাংলায় উচ্চ শিক্ষার গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যদিয়ে শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করা প্রয়োজন। মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে জাপান এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ঃ

> "উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে ? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।"[২৬]

প্রমথ চৌধুরীও 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধের আলোচনায় বলেছেন ঃ

> "ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে; শুধু বাল্য বিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন।"[২৭]

জাতীয় শিক্ষা জাতীয় বিচার বুদ্ধির অধীন করতে হবে। প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করার একমাত্র উপায় বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ভাষা করে তোলা।

---

[২৬] সংকলন ঃ শিক্ষার বাহন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

[২৭] প্রমথ চৌধুরী, আমাদের শিক্ষা (কলকাতাঃ কমলা বুক ডিপো লিমিটেড,১৩২৭),পৃষ্ঠা ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সব দেশেই সমস্যা জর্জরিত। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটি ভীষণ সমস্যা হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ, শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় জীবনের অসামঞ্জস্য। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সমাজিক জীবনের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই খাটাবার তেমন সুযোগ নেই। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত বলে বিবেচ্য। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করাই বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য।[২৮]

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মনের মেধা ও মনীষার বিকাশ। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি এই মনীষা ও মেধার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক নয়।[২৯] বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে সহায়ক, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিজের বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ।[৩০] প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে বিষয় অনুসারে মানুষকে গড়ে তুলতে চাচ্ছে, বিষয়ের অনুগত করে। কিন্তু শিক্ষার আরম্ভ বিষয় দিয়ে নয়, শিক্ষার আরম্ভ শিক্ষার্থীকে দিয়ে। শিক্ষার্থীর ভেতর হতে অন্তর হতে শিক্ষাকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে।[৩১] কিন্তু আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি তা ধরতে পারেনি। নলিনীকান্ত গুপ্তের মতে :

> "আমাদের জাতীয়-শিক্ষা এ কথাটি ধরিতে পারে নাই, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিই ধরিতে পারে নাই। উহারা স্কুলকেই জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে অবশ্য প্রয়োজনীয় ও একমাত্র সঙ্গীরূপে।"[৩২]

---

২৮ ঐ, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫।

২৯ শিক্ষা ও দীক্ষা, নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খন্ড (কলকাতা ঃ পুথন্ত, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৩০৯।

৩০ ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৫।

৩১ ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৬।

৩২ ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপের সকল দেশের শিক্ষা পদ্ধতিই জাতীয় জীবনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছে। এবং তা জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়ে আসছে।[৩৩]

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যই হলো যথার্থ উদ্দেশ্য। 'আমাদের শিক্ষা' গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন ঃ

> "শিক্ষাকে মানব-জীবনের কোনো একটি সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা নিষ্ফল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। শিক্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাতে বহু লোকের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে।"[৩৪]

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে জাতীয় জীবনে বাস্তবায়িত করতে হলে মাতৃভাষার মধ্যদিয়েই দেশের সমস্ত মানুষের চিত্তকে বিকশিত করে তোলা সম্ভব। আর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্ব-স্ব দেশে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।[৩৫]

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমানের শিক্ষার সংগতি হওয়া প্রয়োজন। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। সেজন্য পাশ্চাত্যের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাতৃভাষার মাধ্যমে

---

৩৩ আমাদের শিক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩-৪।

৩৪ ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।

৩৫ সংকলন ঃ শিক্ষার বাহন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তা আত্মস্থ করতে হবে।[৩৬] শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করার পক্ষে জনমত -এর যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কেননা জাতীয় জীবনের আদর্শ কেবল পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে স্থির করা যায় না। এ আদর্শ জাতীয় আশা ভরসা দিয়েই গড়তে হয়। এক্ষেত্রে দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার গুণেই জাতীয় মতি গতির লক্ষ্য স্থির করে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে হয়।[৩৭]

শিক্ষাকে আদর্শমুখী ও কল্যাণকর করার পেছনে শিক্ষকদেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের মনোজগতের ঐশ্বর্যকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করেন। শুধু শিক্ষাদানের মধ্যে শিক্ষকের সার্থকতা নিহিত নয়। প্রমথ চৌধুরীর মতে ঃ

> "শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জ্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান-পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন -এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সফল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন।"[৩৮]

বর্তমানে দেশের শিক্ষা পদ্ধতি ঠিক উল্টো। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে জোর করে বিদ্যা গেলানো হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসে।[৩৯] সেখানে শিক্ষার্থীর অন্তরের বিকাশ লাভ ঘটেনা। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য শিক্ষার্থীও তার অন্তরে পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশেষ করে

---

[৩৬] সংকলন ঃ শিক্ষার মিলন, ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

[৩৭] আমাদের শিক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫।

[৩৮] ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭।

[৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ

> "ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।"[৪০]

দেশে শিক্ষার সংস্কার করতে হলে, প্রথমে ইংরেজীকে পরিহার করে মাতৃভাষার আশ্রয় নিতে হবে, শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হওয়াতেই শিক্ষা নিষ্ফল হচ্ছে। ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে জাতির মনের চেহারা পাল্টে যাবে, এবং শিক্ষায় ও জীবনে আর আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকবে না।[৪১]

শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করার অর্থ সমস্ত জীবনের কর্মপ্রতিষ্ঠানের সাথে তাকে মিলিয়ে ধরা। শিক্ষা হবে জীবনের বিকাশ, প্রস্ফুটন ও পরিণতি লাভ। জীবনের সঙ্গে বাস্তবের সামঞ্জস্য রেখে ছাত্রদের শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেশের শিক্ষার্থীদেরকে এই জীবন হতে কেটে পৃথক করে রাখা হয়েছে। বাইরের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদান নেই, তাদের নিজেদের ভেতরেও একটা জীবন-পরিকল্পনা নেই। জগতের সাথে তাদের যে-রকম সম্বন্ধ, যে-ধরনের আদান-প্রদান, সেটিকে বদলিয়ে দিতে হবে। কথার পরিবর্তে কর্মের ভেতর দিয়ে জগতকে চিনতে হবে। পড়াশুনার Curriculum পরিবর্তন করলেই শুধু শিক্ষার মান উন্নত হবে না।[৪২] শিক্ষার্থীর ভেতর হতে অন্তর হতে শিক্ষাকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন বিদেশী ভাষায় বাহ্য আবরণ থেকে মাতৃভাষাকে মুক্ত করা।

---

৪০ সংকলন ঃ শিক্ষার হেরফের, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১।

৪১ আমাদের শিক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫।

৪২ শিক্ষা ও দীক্ষা পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে স্কুল-কলেজের শিক্ষা অনেকাংশে ব্যর্থ। শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ দেয় না, পরন্তু স্ব-শিক্ষিত হবার শক্তি নষ্ট করে।[৪৩]

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই সর্বজনীন শিক্ষাকে মেনে নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ তা পারেনি। এই সর্বজনীন শিক্ষাই দেশের উচ্চ শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করতে সক্ষম। কিন্তু দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা না করে বরং উচ্চ শিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করে তুলছে।[৪৪] আর এজন্য প্রধান বাধা হয়ে আছে ইংরেজী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমকে শুধু ইংরেজী ভাষায় আবদ্ধ না রেখে তা বাংলার মাধ্যমে খুলে দেয়া হলে দেশে শিক্ষার বিস্তার আরো অনেক বৃদ্ধি পেত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সংকলন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> "বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানা প্রকার সুবিধা হয় না। এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয় শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।"[৪৫]

ইউরোপীয় ভাষাও এক সময় গ্রীক-ল্যাটিনের অধীনে দীর্ঘদিন আবদ্ধ ছিল। ইউরোপ যেদিন বিদেশী ভাষার অধীন থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়, সেদিন ইউরোপে নবযুগের সুত্রপাত হয়। [৪৬] ইউরোপের ন্যায় বাংলা ভাষাকেও বিদেশী ভাষার প্রভুত্ব হতে মুক্ত করতে পারলে বাংলাদেশও নবযুগের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।

---

৪৩ আমাদের শিক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯।

৪৪ সংকলন ঃ শিক্ষার বাহন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২।

৪৫ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭।

৪৬ আমাদের শিক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯২০-১৯৩০ দশকটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের ঢেউ এসে তৃতীয় দশককে আন্দোলিত করে। প্রবন্ধ সাহিত্যে এর প্রতিফলন প্রবলভাবে ঘটে। সেই সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত বাঙালীর চিন্তা-চেতনার পরিচয় নেবার চেষ্টা করা হয়েছে অভিসন্দর্ভে।

বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তকে যে সমস্ত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে সেগুলি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। বিচ্ছিন্ন কোন প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা হয়নি। অনুবাদ ও জীবনী সাহিত্য পরিহার করা হয়েছে। আলোচ্য দশকে প্রকাশিত প্রবন্ধ-পুস্তকে সংকলিত কিছু কিছু প্রবন্ধ আগে প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সাময়িকীতে। পরবর্তীকালে তা পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়। ফলে আলোচিত প্রবন্ধ-পুস্তকের মাধ্যমে এই দশকের ভাবনা সবসময় প্রতিফলিত হয়েছে তা বলা যাবে না। এতে আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, অনেক সময় একই বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ সংকলিত হওয়ায় কোন কোন বইকে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনার্ভুক্ত করতে হয়েছে। যেমন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংকলন'; প্রমথ চৌধুরীর 'আমাদের শিক্ষা'; কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্যায় ১ম ও ২য় খন্ড' প্রভৃতি।

দুই

এই সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিতে প্রধান অংশ জুড়ে আছে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন, ক্রমান্বয়ে অধিকার বিস্তার, ভারতবাসীর ওপর অত্যাচার, 'ফিরিঙ্গি বণিক্' গ্রন্থের মূল বিষয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন, তার তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা অনেক প্রবন্ধে আছে। রাজনীতি বিষয়ক পনের/ষোলটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ভাস্‌কো-ডা-গামার (আনুমানিক ১৪৬৯-১৫২৪) ভারতবর্ষে পদার্পণের মধ্যদিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের এদেশে আগমনের সূত্রপাত ঘটে। 'ফিরিঙ্গি বণিক্' গ্রন্থে পর্তুগীজ জলদস্যুদের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অত্যাচারের মধ্য দিয়েই তারা ভারতীয় বন্দরগুলি দখল করে নেয়। এরপর পর্যায় ক্রমে ইউরোপীয় অন্যান্য বণিকরা এদেশে এসে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে প্রয়াসী হয়। ইংরেজ শাসন-শোষনে এদেশবাসী অতিষ্ট হয়ে স্বাধিকার আন্দোলনে সুসংগঠিত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে।

'ভারতের সাম্যবাদ' গ্রন্থে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে প্রবন্ধ রয়েছে। গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করে তোলে; যদিও সেই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনকে অনেকেই সমর্থন করেননি। 'পথ ও পাথেয়'; 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ'; 'জাতিগঠনে বাধা-ভিতরের ও বাহিরের'; 'বৈশাখী-বাঙলা'; 'কমলাকান্তের পত্র'; 'রুদ্র-মঙ্গল'; 'তরুণের-বিদ্রোহ' গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়নি। বরং সহিংস আন্দোলনের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে।

অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি খেলাফত আন্দোলনও (১৯১৯-২৪) পরিচালিত হয়েছে। এদশকে চারজন লেখকের 'খেলাফত আন্দোলন' প্রসঙ্গে চারটি গ্রন্থ রচনার কথা জানা যায়। আবুবকর সিদ্দিকীর 'খেলাফত আন্দোলন পদ্ধতি' (১৯২১); ইয়াসিনুদ্দীনের 'খেলাফত আন্দোলন পদ্ধতি' (১৯২২); গোলাম আকবর আলী বেগ ও অক্ষয়চন্দ্র ভদ্রের 'খেলাফৎ ও মোস্লেম জগৎ'

Dhaka University Institutional Repository

(১৯২২) এবং মঈনুদ্দীন হুসায়ন-এর 'খেলাফত প্রসঙ্গ' (১৯২১)। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করা যায়নি বলে আলোচনার অন্তরর্ভুক্ত হয়নি।

নিজেদের শাসনকে পাকা-পোক্ত করার লক্ষ্য ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর সম্প্রীতির বন্ধনকে বিনষ্ট করতে অপপ্রয়াস চালায়। 'রুদ্র-মঙ্গল'; 'যুগবাণী'; 'বাঙ্গালী মুসলমান'; 'সংকলন'; 'ভারতের সাম্যবাদ'; 'ফিরিঙ্গি-বণিক্' গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলা হয়েছে। ইংরেজ সুকৌশলে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করে তোলে। এহেন পরিস্থিতির ভেতরেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে তোলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) মধ্যেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭);এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় ইংরেজ সরকারের ভিত শিথিল হয়ে পড়ে।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে সেদেশে বোলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে। 'নব্যরুশিয়া'; 'বোলশেভিকবাদ'; 'ভারতের সাম্যবাদ'; 'যুগবাণী'; 'রুদ্র-মঙ্গল'; 'বাংলার বল্‌শী'; গ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতা ও ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে।

'ভারতের সাম্যবাদ' গ্রন্থে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার কথা বলার পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে বলা হয়েছে। লেখকদের মতে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্র মানুষের উপর জোর করে চাপিয় দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে ভারতীয় সমাজে এর প্রচলন হয়েছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততায়।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

বিশ দশকে রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছিল বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে। কর্মযোগ, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, শক্তিসাধনা, জ্ঞান ও যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা অনেক প্রবন্ধে আছে। ধর্ম বিষয়ে দশজন গুরুত্বপূর্ণ লেখকের বই আলোচনা করা হয়েছে।

কর্মই হচ্ছে সৃষ্টির মূল ভিত্তি। এই কর্মানুযায়ীই মানব ফললাভ করে। মানুষের ব্যক্তিগত কর্মফল কখনো-কখনো জাতিগত কর্মফলে পর্যবসিত হয়। 'কর্ম্মযোগ'; 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে ব্যক্তিগত কর্মফল জাতিগত কর্মফলে পর্যবসিত হয়ে ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়। আর্যগণ অনার্যদের উপর অত্যাচার করেছিল বলেই আজকে ভারতের মানুষ তার ফল ভোগ করছে।

কর্মফলের পাশাপাশি জন্মান্তরবাদও হিন্দু ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। শুধু হিন্দু ধর্মই একে বিশ্বাস করে না ; ইসলাম এবং খ্রীস্টান ধর্মও জন্মান্তরবাদ সমর্থন করে বলে কোন-কোন লেখক বলেছেন। 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর'; 'যজ্ঞ-কথা'; 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থে জন্মান্তরবাদকে কোথাও প্রত্যক্ষ এবং কোথাওবা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছে। 'ইছলাম ও আদর্শ-মহাপুরুষ' গ্রন্থে জন্মান্তরবাদকে দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিবর্তনবাদকে স্বীকার করেছে। বিবর্তনবাদ প্রকারন্তরে জন্মান্তরবাদেরই নামান্তর বলে লেখকেরা ব্যাখ্যা করেছেন।

অবতারবাদ হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে। জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে নিলে অবতারকেও স্বীকার করতে হয়। ধর্মে গ্রন্থে অবতারদের কথা বলা হয়েছে। 'অবতার তত্ত্ব'; 'বেদান্ত-পরিচয়'; 'যজ্ঞকথা'; 'মানব-মুকুট'; 'মোস্তফা-চরিত'; গ্রন্থে অবতারবাদের কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণ-যীশু-মোহাম্মদকে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের অবতার হিসেবেই তাঁদেরকে মনে করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'মহাপূজা'; 'সংকলন ঃ উৎসবের দিন, দুঃখ'; 'পাল-পার্ব্বণ' গ্রন্থে শক্তি সাধনার মধ্যদিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং সেই সাথে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। হিন্দুধর্মে দুর্গাপূজার ভেতর দিয়ে শক্তি সাধনার আরাধনা চলেছে। এই আরাধনার মূল সুরই হচ্ছে সাম্য। আর এই সাম্যের ভেতর দিয়েই পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করা সম্ভব।

জ্ঞান আহরণ ছাড়া আত্মিক এবং ব্যক্তি তথা জাতির উন্নিত সম্ভব নয়। জ্ঞান আহরণের জন্য প্রচীন আর্য জাতি যাগ-যজ্ঞের আয়োজন করে। এই যাগ-যজ্ঞের ভেতর দিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করার মাধ্যমে আত্মোন্নতির পাশাপাশি জগতের সকল প্রাণির উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করা হতো। 'যজ্ঞ-কথা' গ্রন্থে জ্ঞান ও যাগ-যজ্ঞের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

চার

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্পর্ক, লেখকের অন্তর্জীবনের সঙ্গে মিলেয়ে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, কাব্য রচনার উপাদান, সমাজ জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা, সাহিত্য সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আটটি প্রবন্ধগ্রন্থ এই দশকে রচিত হয়েছিল-তাছাড়া অন্যান্য বইয়েও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে।

সাহিত্যের কাজ হলো সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করা। সৎ বা ভাল সাহিত্যই তা করতে সক্ষম। 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা'; 'বাণী-মন্দির' গ্রন্থে সমাজ জীবনে সৎ ও অসৎ সাহিত্যের প্রভাব কী ভাবে প্রতিফলিত হয় তা বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক গল্প-উপন্যাস মানুষের সুস্থ জীবনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এতে করে সমাজ জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্পর্ক অপরিসীম। সহিত্যের ভেতর দিয়ে বাঙালী জাতির ঐতিহ্যের পাশাপাশি দেশের পরিচয়ও ফুটে ওঠে। শশাঙ্কমোহন সেনের 'মধুসূদন'; নলিনীকান্ত গুপ্তের 'সাহিত্যিকা'; চিত্তরঞ্জন দাশের 'কাব্যের কথা' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের ভেতরেই বাংলার অন্তরাত্মার প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব কবিদের সাধনা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর সাধনা। বৈষ্ণব কবিদের পাশাপাশি শাক্তপদাবলী ও কবিওয়ালাদের গানেও বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উদ্বোধন ঘটেছে।

লেখকের অন্তর্জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে শশাঙ্কমোহন সেন ও নলিনীকান্ত গুপ্ত মনে করেন। 'সাহিত্যিকা'; 'রূপ ও রস'; 'মধুসূদন' গ্রন্থে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন লেখকগণ সৎ ও সুন্দরের পূজারী ছিলনে। লেখকেরা কবির অন্তর্জীবনের আলোকে সাহিত্য সাধনা ব্যাখ্যা করেছেন। কবিদের অন্তরাত্মার ছবি তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। কবিদের অন্তর্জীবনকে বুঝতে পারলে তাঁদের কাব্য-সাহিত্যকেও বুঝা যায়।

এ সময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা। পাঠকের চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটানোই লেখকের বড় দায়িত্ব বলে তাঁরা মনে করছেন। শব্দের ঝঙ্কার, ছন্দের ব্যঞ্জনা, অলংকারের কারুকার্য ও ধ্বনি ময়তার মধ্যদিয়ে মানব হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলাই হলো প্রকৃত কবির সাধনা। এর মধ্যদিয়েই পাঠক কাব্য পাঠ করে আনন্দ পায় এবং পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের আনন্দ অনুভব করে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ও নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রূপ ও রস' এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতে ঃ

> "কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনো দেশে,
> কোনো কালে, আর কেউ বলেনি।"[১]

---

[১] কাব্য জিজ্ঞাসা (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৩), পৃষ্ঠা ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কাব্য মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রশান্ত ও সুন্দর মূর্তি কাব্যের আঙ্গিক সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করে তোলতে প্রয়াস পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কালিদাসের কাব্য-নাটকের শাশ্বত সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। আধুনিক সাহিত্যে কালিদাসের সময়কালকে কোনক্রমেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাছাড়া 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'য় লেখক বলতে চেয়েছেন যে, ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুর মনোজগৎ উদ্ভাসিত হয়। 'রাজসিংহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাণবন্ততা আধুনিক ঔপন্যাসিকদের তুলনায় অনেক বেশী।

অতীতে বাঙালী মুসলমানের জীবনে সাহিত্য চর্চা তেমনভাবে বিকাশলাভ করেনি। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের অনীহা। তাঁরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিচার করেছেন। এস. ওয়াজেদ আলির 'মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য'; কাজী আবদুল ওদুদের 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' ও 'সাহিত্যে সমস্যা' প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের মাতৃভাষার প্রতি অনীহা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার পাশাপাশি এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্পর্কেও বলা হয়েছে। সাহিত্যই একটি জাতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সক্ষম।

পাঁচ

এই সময়ে প্রকাশিত সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে যৌবন ধর্ম, মুসলমান সমাজের অতীতমুখিতা, নারী স্বাধীনতা, পাশ্চাত্য প্রভাব ও পরনির্ভরতা, মানবিক মূল্যবোধ, বাংলার কৃষক সমাজ ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। অনেক লেখকই সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যৌবনের কাজ হচ্ছে সমাজের প্রাচীন নিয়মনীতি ভেঙ্গে সমাজ জীবনে নতুন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করা। 'তারুণ্য' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে যৌবন। কিন্তু বাঙালী একে এড়িয়ে চলতে চায়। তারা সনাতন ধ্যান-ধারণা বা মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে মানব জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটায়।

বাঙালী মুসলমান সমাজ অতীতকে এড়িয়ে আধুনিক সমাজ জীবনে প্রবেশের পথে বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এসমাজ ধর্মের বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। বিভিন্ন বিধি-নিষেধের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত হয়ে মুসলমানদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। নারীর অবরোধ প্রথা, শিল্পকলার ক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুদপ্রথার উপর বিধি-নিষেধের ফলে মুসলমান সমাজ অন্য সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্যায়' (প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড); এস. ওয়াজেদ আলির 'বাঙ্গালী মুসলমান' [অভিভাষণ]; 'মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে মুসলমানের দুরবস্থা, ধর্মীয় কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং চিন্তা-চেতনায় পশ্চাৎপদতার কথা বলা হয়েছে।

'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ'; 'নবপর্যায়' (প্রথম খন্ড); 'নারীর মূল্য' এবং 'নারীর উক্তি' গ্রন্থে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালী সমাজ যুগ যুগ ধরে নারী জাতির উপর অত্যাচার করেছে। ধর্মীয় বিধি-বিধানের অজুহাতে আবার কখনো পুরুষের পেশী শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনের ভেতর দিয়ে এ অত্যাচার যুগ যুগ ধর চলে আসছে। নারী জাতিকে দূরে সরিয়ে রেখে সমাজ তথা দেশের মঙ্গল ও উন্নতির পথকে রুদ্ধ করা হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ নারী জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু গোঁড়া আলেম সমাজ তাঁর আদেশকে লঙ্ঘন করে চলছে।

বর্তমানে নারী শিক্ষার ব্যপ্তি ঘটায় সমাজে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে নারীর স্বাধীনতা আজ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু গ্রামের বেশীর ভাগ নারী আজও সেই বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলাদেশ পাশ্চাত্যের স্পর্শে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। 'প্রবন্ধ-মালা'; 'সংকলন'; 'যাত্রী'; 'মহৎ-জীবন' ও 'মানব-জীবন' গ্রন্থের কোন কোন প্রবন্ধে পাশ্চাত্য প্রভাব ও পরনির্ভরতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। বাঙালী পাশ্চাত্যের ভাবকে গ্রহণ করে নিজের সংস্কৃতিকে পরিহার করায় সমাজ জীবনে এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সবক্ষেত্রেই তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের ভাল দিকগুলি গ্রহণ করলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হতো। কিন্তু বাঙালী সমাজ তা না করে শুধু পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে সমাজ তথা দেশের উন্নতির পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। সেই সাথে মনের পরাধীনতার কারণে তারা দিন দিন শৌর্য-বীর্যহীন হয়ে পড়ছে।

যে জাতির জীবনে মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতি রয়েছে সে জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। 'রায়তের কথা'; 'মহৎ-জীবন'; 'মানব-জীবন'; 'যাত্রী' গ্রন্থে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা আছে। আধুনিক সমাজে মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতি রয়েছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব, জাতিতে-জাতিতে দ্বন্দ্ব এই মানবিকতার অভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের অভাবে সমাজে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে; জমিদার প্রজার উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। সমাজে মহৎ ও উন্নত চরিত্রের লোকের অভাবেই জাতির জীবনে এই দুরবস্থা নেমে এসেছে।

বাংলার কৃষক সমাজের দুরবস্থা 'বাংলার বল্‌শী'; 'রায়তের কথা'; 'রূপক ও রহস্য' গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। অতীতকাল থেকেই বাংলার কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। কৃষক সমাজ সারাদিন পরিশ্রম করেও দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে পারেনা। তাদের সন্তানরাও শিক্ষার অভাবে পিতার পেশাকেই বেছে নিচ্ছে। জমিদার ও জোতদারের আগ্রাসী ভূমিকায় ঋণের টাকা পরিশোধ করতে যেয়ে ঘরের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। সরকারও এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সরকারী ব্যাংকও এক্ষেত্রে জোতদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে । পশু চিকিৎসক ও চিকিৎসালয়ের অভাবে কৃষকের হালের গরু মারা যাওয়ায় কৃষকের জীবনে নেমে আসছে অন্ধকার। কিন্তু এতদবস্থার মধ্যেও গ্রামীণ সমাজ জীবনে কৃষকদের ভেতরে বারো মাসে তের পার্বণের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

ছয়

বিশ দশকে রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। প্রেম, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা অনেক প্রবন্ধে আছে।

এ মহাবিশ্বে সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হচ্ছে প্রেম। 'যাত্রী'; 'সখী'; 'প্রেমের কথা' গ্রন্থে প্রেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আছে। নারীকে কেন্দ্র করেই প্রেম বিভিন্নরূপে আবর্তিত হয়। এ প্রেম কখনো ঈশ্বরাভিমুখী আবার কখনো জাগতিক। নারীর প্রেম কখনো পুরুষকে পূর্ণ শক্তিতে জাগিয়ে তুলে; আবার কখনো পুরুষের আত্মবিকাশের তপস্যাকে ভূ-লুণ্ঠিত করে। প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিচ্ছেদের ভেতর দিয়েই শক্তির কাজ করার ক্ষেত্র পায়। প্রেমের বিচিত্র রূপের প্রকাশ বিচিত্র ভাবেই পৃথিবীতে ঘটে থাকে। প্রাচীন কালে প্রেমের ক্ষেত্রে পাত্রী জাত বিচার করে প্রণয় পাত্র নির্বাচন করতো। কিন্তু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রেমের ক্ষেত্রে জাতের বিচার মুখ্য নয়। ভাললাগাটাই হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আধুনিক সমাজ জীবনে প্রেম ছোঁয়াচে রোগের ন্যায় সমাজের রন্ধে-রন্ধে প্রবেশ করেছে।

মানব মনের যথার্থ অবস্থা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। 'সংকলন' ও 'যাত্রী'র বিভিন্ন প্রবন্ধে মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সৃষ্টির লীলা সৌন্দর্যের মধ্যে মানব তার মন প্রাণকে একাত্ব করে এই আনন্দের অংশীদারের ভাগী হ'ন। স্রষ্টার এই লীলাভূমিতে মানুষের মন বস্তুর মোহ থেকে আনন্দলোকে পৌঁছে। শিশুর অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশের মধ্যেও স্রষ্টার পূর্ণতা উপলব্ধি করা যায়। মানব মন কখনো কখনো স্থূল জগৎ ছেড়ে সূক্ষ্ম জগতে

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণ করে। মন তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে এ পৃথিবীতে তার আগমন সম্পর্কে।

জগতের উদ্ভব ও প্রাণের আবির্ভাবকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লষণ করে 'বিচিত্র-জগৎ'; 'জগৎ-কথা'; 'অব্যক্ত' গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিচারে প্রোটোপ্লাজম থেকে প্রাণের উৎপত্তি। এ পৃথিবীতে জড় এবং প্রাণের মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা যুদ্ধ চলছে। প্রাণ জড়কে আত্মসাৎ করে প্রাণি পদার্থে পরিণত করতে চায়; অন্যদিকে জড়ও প্রাণকে হজম করে জড় বস্তুতে পরিণত করতে নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রাণি-পদার্থের জড়ত্বে পরিণতির নামান্তর হলো মৃত্যু। এ বিশ্বজগতে মহাশক্তির প্রভাবেই বিশ্বজগৎ অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং জীবনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। প্রাণির ন্যায় উদ্ভিদও উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে। অধিক উত্তেজনায় প্রাণি অবসাদগ্রস্ত হয়ে শেষে মৃত্যুবরণ করে, তেমনি উদ্ভিদও উত্তেজনার চাঞ্চল্যে অবসাদগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়-শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার উদ্দেশ্য, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি, শিক্ষকের কর্তব্য, শিক্ষার সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে 'সংকলন'; 'আমাদের শিক্ষা'; 'শিক্ষা ও দীক্ষা' গ্রন্থের কোন-কোন প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দেশে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করে শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখা সম্ভব। মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তুলে ধরতে হবে। কিন্তু দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা না করে বরং শিক্ষাকে সংকুচিত করতে সচেষ্ট। ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে শিক্ষাকে সংকুচিত করা হচ্ছে। শিক্ষাকে আদর্শমুখী ও কল্যাণকর করার পেছনে শিক্ষকদেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের মনোজগতের ঐশ্বর্যকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করেন। কিন্তু দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রসারতা ঘটছেনা। দেশে শিক্ষার সংস্কার করতে হলে ইংরেজীকে পরিহার করে মাতৃভাষার আশ্রয় নিতে হবে, এবং শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করে অর্থাৎ সমস্ত জীবনের কর্ম-প্রতিষ্ঠানের সাথে তাকে মিলিয়ে ধরতে হবে। সেই সাথে সর্বজনীন শিক্ষাকে মেনে নিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষার পথকে প্রশস্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ক) আলোচিত গ্রন্থ ঃ

১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ফিরিঙ্গি-বণিক্ (কলকাতা ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, ১৩৬১, প্রথম মুদ্রণ ১৯২২)।

২. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মহাপূজা (কলকাতা ঃ বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ১৩২৮); রূপক ও রহস্য (চুঁচুড়া, ১৩৩০)।

৩. অশ্বিনীকুমার দত্ত, কর্ম্মযোগ, অশ্বিনীকুমার রচনা সংগ্রহ, বদিউর রহমান সম্পাদিত (বরিশাল ঃ জীবনানন্দ একাডেমী, ১৯৯২, প্রথম প্রকাশ ১৩৩২)।

৪. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪০৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৫)।

৫. অন্নদাশঙ্কর রায়, তারুণ্য, অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, প্রথম খন্ড (কলকাতা ঃ বাণী শিল্প,১৯৮৭, প্রথম প্রকাশ, ১৯২৮)

৬. আকরম খাঁ, মোহাম্মদ, মোস্তফা চরিত (ঢাকা ঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫, প্রথম প্রকাশ ১৯২৫)।

৭. আবদুল ওদুদ, কাজী, নবপর্যায়, প্রথম খন্ড (১৩৩৩); দ্বিতীয় খন্ড (১৩৩৬), শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা ঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩)।

৮. আবুল হুসেন, বাংলার বল্‌শী (ঢাকা ঃ তরুণপত্র' কার্যালয়, ১৩৩২)।

৯. আহ্‌ছানউল্লা, খানবাহাদুর, ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (ঢাকা ঃ জয় পাবলিশার্স, ১৯৯২, প্রথম প্রকাশ ১৯২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, নারীর উক্তি (কলকাতা, ১৯২০)।

১১. এয়াকুব আলী চৌধুরী মানব-মুকুট (কলকাতা ঃ নওরোজ লাইব্রেরী, ১৯৫৩, প্রথম প্রকাশ ১৯২২)।

১২. ওয়াজেদ আলি, এস. মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য, এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, প্রথম প্রকাশ ১৩৩২), বাঙ্গালী-মুসলমান [অভিভাষণ], ঐ, (প্রথম প্রকাশ ১৯৩০)।

১৩. চারুচন্দ্র রায়, কমলাকান্তের পত্র (চন্দননগর, প্রবর্তক পাব্‌লিশিং হাউস, ১৩৩০)।

১৪. চিত্তরঞ্জন দাশ, কাব্যের কথা (কলকাতা ঃ ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৯২০)।

১৫. জগদীশচন্দ্র বসু, অব্যক্ত (কলকাতা ঃ বাউলমন প্রকাশন, ১৪০০, প্রথম প্রকাশ ১৩২৮)।

১৬. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ-মালা (শান্তিনিকেতন, ১৩২৭)।

১৭. নজরুল ইসলাম, কাজী, যুগবাণী (১৯২২); রুদ্র মঙ্গল (১৯২৬), দুর্দিনের যাত্রী (আনুমানিক ১৯২৬), নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬)।

১৮. নলিনীকান্ত গুপ্ত সাহিত্যিকা (১৯২০); রূপ ও রস (১৯২৮); শিক্ষা ও দীক্ষা (১৯২৮), নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খন্ড (কলকাতা ঃ শৃথন্ত্র, ১৯৭৫)।

১৯. নলিনীকিশোর গুহ, পথ ও পাথেয় (কলকাতা ঃ আর্য পাব্‌লিশিং হাউজ, ১৩৩৫।)

Dhaka University Institutional Repository

২০. প্রমথ চৌধুরী, আমাদের শিক্ষা (কলকাতা, বাঁকীপুর ঃ কমলা বুকডিপো, লিমিটেড্, ১৩২৭); দু-ইয়ারকি (কলকাতাঃ ১৯২০); রায়তের কথা, প্রবন্ধ সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৪, প্রথম প্রকাশ ১৯২৬)।

২১. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জাতিগঠনে বাধা-ভিতরের ও বাহিরের (গ্রন্থের আখ্যা পত্র পাওয়া যায়নি, ১৯২১)।

২২. বর্‌কতুল্লাহ্ মোহাম্মদ, পারস্য-প্রতিভা, প্রথম খন্ড (কলকাতা ঃ রায় এন্ড রায় চৌধুরী, ১৩৩০)।

২৩. বলাই দেবশর্ম্মা, বৈশাখী-বাঙলা (বর্দ্ধমান ঃ সারস্বত সাহিত্য-মন্দির, ১৩৩৭)।

২৪. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাল-পার্ব্বণ (চন্দননগর ঃ প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, ১৩৩১)।

২৫. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা (কলকাতা ঃ ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্, ১৩২৮)।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ১৩৮৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৩২); যাত্রী, রবীন্দ্র রচনাবলী, উনিশ খন্ড (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬)।

২৭. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিচিত্র-জগৎ, রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র, তৃতীয় খন্ড, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত (কলকাতা ঃ গ্রন্থমেলা, ১৩৮৪, প্রথম প্রকাশ ১৯২০); যজ্ঞ-কথা (কলকাতা ঃ "সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী", ১৩২৭); জগৎ-কথা, রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, চতুর্থ খন্ড (কলকাতা ঃ গ্রন্থমেলা, ১৩৮৬, প্রথম প্রকাশ ১৯২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমের কথা (কলকাতা ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩২৭); সখী (কলকাতা ঃ ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্, ১৩২৮)।

২৯. লুত্‌ফর রহমান, ডাক্তার, মোহাম্মদ, মহৎ-জীবন (১৩৩৩); মানব-জীবন (১৩৩৪), লুত্‌ফর রহমান রচনাবলী, প্রথম খন্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭২)।

৩০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারীর মূল্য, শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, নবম সম্ভার, ষষ্ঠ মুদ্রণ (কলকাতা ঃ এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ কাল নেই, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩); তরুণের বিদ্রোহ, শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, এয়োদশ সম্ভার, তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ (কলকাতা ঃ এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ কাল নেই, প্রথম প্রকাশ ১৯২৯)।

৩১. শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন, অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা ঃ এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৯৫৯, প্রথম প্রকাশ ১৯২২); বাণীমন্দির (কলকাতা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৮)।

৩২. শৈলেশনাথ বিশী, বোলশেভিকবাদ (কলকাতা ঃ বুক কোং, ১৩৩১)।

৩৩. সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, ভারতের সাম্যবাদ (কলকাতা ঃ খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৩৩৭)।

৩৪. সরোজ আচার্য, নব্য রুশিয়া, সরোজ আচার্য রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড (কলকাতা ঃ পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮৮, প্রথম প্রকাশ ১৯২৫)।

৩৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্ত পরিচয় (কলকাতা, ১৩৩১); কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর (কলকাতা, ১৩৩২); অবতারতত্ত্ব (কলকাতা, ১৩৩৫)।

Dhaka University Institutional Repository

খ) সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. অধীর দে, আধুনিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, অখন্ড সংস্করণ (কলকাতাঃ সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৯৬২); আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, ১ম খন্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা ঃ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮)।

২. অমরেন্দ্র নাথ রায়, বঙ্গ সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম ও ভাষা-প্রীতি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২)।

৩. অজিত কুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা ঃ পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৮৩)।

৪. অনাথ নাথ বসু, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫২)।

৫. অনাথ বন্ধু বেদজ্ঞ, সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি (কলকতা ঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯৬৩)।

৬. অনিলচন্দ্র ঘোষ, রাজর্ষি রামমোহন রায়-জীবনী ও রচনা, তৃতীয় সংস্করণ (কলকাতা ঃ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, তারিখ নেই)।

৭. অনিল রায়, সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ (কলকাতা ঃ জয়শ্রী, ১৯৮১)।

৮. অন্নদাশঙ্কর রায়, শিক্ষার ভবিষ্যৎ (কলকাতা ঃ ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৮৮)।

৯. ঐ, শিক্ষার সঙ্কট (কলকাতা ঃ শঙ্কর প্রকাশন, ১৯৭৬)।

১০. অপূর্বকুমার রায়, উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য ঃ ইংরেজী প্রভাব (কলকাতা ঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬)।

Dhaka University Institutional Repository

১১. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, প্রথম সংস্করণ (কলকাতাঃ গ্রন্থকার, ১৩৩৯)।

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (কলকাতা ঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্‌লিশিং কোং, ১৩৬৩)।

১৩. ঐ, সমালোচনার কথা (কলকাতা ঃ সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬৪)।

১৪. ঐ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা ঃ বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৫)।

১৫. ঐ, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খন্ড (কলকাতা ঃ মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৭০)।

১৬. ঐ, শরৎ প্রসঙ্গ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (কলকাতা ঃ সাহিত্য শ্রী, ১৯৭৬)।

১৭. আকরম হোসেন, সৈয়দ সম্পাদিত, এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী, ১ম খন্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

১৮. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ ঃ আধুনিক যুগ (ঢাকা ঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৩৭৬)।

১৯. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খন্ড (ঢাকা ঃ বর্ণমিছিল, ১৩৮৫)।

২০. আবদুল কাদের, শরীফ মোঃ, ইসলামে নারীর মর্যাদা (বাকেরগঞ্জ দারুচ্ছালাম কুতুব খানা, ১৯৫৭)।

২১. আবদুল কাদির সম্পাদিত, লুত্‌ফর রহমান রচনাবলী, ১ম খন্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭২)।

Dhaka University Institutional Repository

২২. ঐ, নজরুল রচনাবলী, ১ম খন্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬)।

২৩. ঐ রোকেয়া রচনাবলী (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)।

২৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৯০)।

২৫. আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫)।

২৬. আবদুল ওদুদ, কাজী, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা ঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩)।

২৭. ইকবাল ভুঁইয়া, শশাঙ্কমোহন সেন (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)।

২৮. এনামুল হক, মুহম্মদ, ডক্টর, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ (ঢাকা ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্‌, ১৯৬৫)।

২৯. ওয়াকিল আহমদ, ডক্টর, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)।

৩০. ঐ, সম্পাদিত, বাঙালীর চিন্তাধারা ঃ আধুনিক যুগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯০)।

৩১. কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক যুগ, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা ঃ এ. মুখার্জ্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৬৪)।

৩২. কালিদাস রায়, সাহিত্য প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ম ও ২য় খন্ড (কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৮)।

৩৩. কোকো আন্তোনভা ও অন্যান্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মস্কো ঃ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮২)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. ক্ষেত্রগুপ্ত, মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্য শিল্প, তৃতীয় সংস্করণ (কলকাতা ঃ এ. কে. সরকার এ্যান্ড কোং, ১৩৮২)।

৩৫. ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৬)।

৩৬. ঐ, হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৯)।

৩৭. ঐ, প্রাচীন ভারতে নারী (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫০)।

৩৮. জহরলাল বসু, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস (কলকাতা ঃ আখ্যাপত্র নেই)।

৩৯. দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য (কলকাতা ঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯)।

৪০. নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, ১ম খন্ড (কলকাতা ঃ শৃণ্বন্তু, ১৯৭৫)।

৪১. নীলরতন সেন, প্রসঙ্গ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (কলকাতা ঃ সাহিত্যলোক, ১৯৮৭)।

৪২. প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খন্ড (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৪)।

৪৩. বদিউর রহমান সম্পাদিত, অশ্বিনীকুমার রচনা সংগ্রহ (বরিশাল ঃ জীবনানন্দ একাডেমী, ১৯৯২)।

৪৪. বিনয় ঘোষ, বাঙলার নবজাগৃতি (কলকাতা ঃ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৪৮)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. বিবেকানন্দ, স্বামী, কর্ম্মযোগ (কলকাতা ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩১৪)।

৪৬. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ডঃ, সম্পাদিত, রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র (কলকাতা ঃ গ্রন্থমেলা), ৩য় খন্ড (১৩৮৪), ৪র্থ খন্ড (১৩৮৬)।

৪৭. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ২য় খন্ড (কলকাতা ঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটড পাব্‌লিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৮০)।

৪৮. মনীন্দ্র দত্ত ও হারাধন দত্ত সম্পাদিত, চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু রচনা সমগ্র (কলকাতা ঃ তুলিকলম, ১৩৮৫)।

৪৯. মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বঙ্গভঙ্গ (ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১)।

৫০. মুসা কালিম, ডঃ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (কলকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮)।

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলাকা (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৫)।

৫২. ঐ, স্বদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা ঃ ইন্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্, তারিখ নেই)।

৫৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯ খন্ড (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী, ১৯৭৬)।

৫৪. রমনীমোহন চক্রবর্তী, বাংলা সাহিত্যের আধুনিককাল (কলকাতা ঃ ভারতী বুক স্টল, ১৯৬৫)।

৫৫. রাজশেখর বসু সংকলিত, চলন্তিকা, আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান (কলকাতা ঃ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৮৯)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলার ইতিহাস, ২য় খন্ড (কলকাতা ঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১)।

৫৭. শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, ৯ম সম্ভার; ১৩শ সম্ভার, তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, (কলকাতা ঃ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রকাশকাল নেই)।

৫৮. শিশির কুমার দাশ, মধুসূদনের কবিমানস (কলকাতা ঃ বুকল্যান্ড, ১৯৫৬।

৫৯. শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস (কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০১)।

৬০. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য সংকলিত,সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫)।

৬১. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, সাহিত্যসেবক-মঞ্জুষা [গ্রন্থকার চরিতাভিধান], প্রথম খন্ড, ১৯৮৩, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৮৫ (কলকাতা ঃ সাহিত্যলোক)।

৬২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের কথা, চতুর্থ সংস্করণ (কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬৪)।

৬৩. সরল চট্টোপাধ্যায়, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ (কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫)।

৬৪. সরোজ আচার্য রচনাবলী, ২য় খন্ড (কলকাতা ঃ পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮৮)।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ১ম খন্ড (কলকাতা ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৮৫) ।

৬৬. Suranjan Das, Communal Riots in Bengal 1905-1947 (Delhi: Oxford University Press, 1991).

৬৭. সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত, ওদুদ-চর্চা (ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮২) ।

৬৮. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড (কলকাতা ঃ ইস্টার্ণ পাব্‌লিশার্স, ১৯৭১) ।

৬৯. সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (কলকাতা ঃ প্রকাশ ভবন, ১৯৬৮) ।

৭০. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (কলকাতা ঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬) ।

৭১. S. C. Sengupta, Saratchandra : Man and Artist (New Delhi : Sahitya Akademi, 1975).

৭২. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রা চিন্তা (কলকাতা ঃ জি. এ. ই. পাব্‌লিশার্স, ১৯৯১) ।

৭৩. হিরন্ময় ভট্টাচার্য, নির্বাসিত সাহিত্য (কলকাতা, ১৩৮৮) ।

Dhaka University Institutional Repository

গ) প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ *: ঃ

১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ফিরিঙ্গ-বণিক্ (১৯২২); অজ্ঞেয়বাদ (১৯২৮)।

২. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মহাপূজা (১৩২৮); রূপক ও রহস্য (১৩৩০); সাহিত্য-সাধনা (১৯২৩)।

৩. অশ্বিনীকুমার দত্ত, কর্ম্মযোগ (১৩৩২)।

৪. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা (১৩৩৫)।

৫. অরবিন্দ ঘোষ, ধর্ম ও জাতীয়তা (১৩২৭); কারা কাহিনী (১৯২১)।

৬. অন্নদাশঙ্কর রায়, তারুণ্য (১৯২৮)।

৭. অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, বিদ্রোহী রুশিয়া (১৯৩০)।

৮. আকবর আলী আখন্দ, মুহম্মদ, সমাজ সংস্কার ও পল্লীবাসী (১৯২৮)।

৯. আকরম খাঁ, মোহাম্মদ, মোস্তফা চরিত (১৯২৫)।

১০. আজিজর রহমান, মুহম্মদ, আর্য সমাজীর সওয়ালের জওয়াব (১৯২৯); পুনর্জন্ম বিচার (১৯৩০)।

১১. আনসর আলী মুহম্মদ, সুদ নিবারণী সমিতি (১৯২৬)।

১২. আনিসর রহমান, মাওলানা মুহম্মদ, স্বর্গের পথ (১৯২৬)।

১৩. আফজালুল হক, প্রজাস্বত্ব আইন ও কংগ্রেস স্বরাজ্যদল (১৯২৯)।

১৪. আফতাব আহম্মদ, কৃষকের কথা (১৯২৮)।

১৫. আফতাবুদ্দীন ভুঞা, মিলনের পথে (১৯২৮)।

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থপঞ্জীর সহায়তায় এই তালিকা তৈরী করা হয়েছে ঃ

ক) অধীর দে, আধুনিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা (কলকাতা ঃ সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৯৬২)।

খ) আলী আহমদ (সংকলিত), বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

গ) সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, দ্বিতীয় খন্ড (কলকাতা, ১৯৮৫)।

ঘ) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড (কলকাতা ঃ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭১)।

ঙ) হিরন্ময় ভট্টাচার্য, নির্বাসিত সাহিত্য (কলকাতা, ১৩৮৮)।

চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী ও কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার ক্যাটালগ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. আবদুর রহমান, মুহম্মদ, এত্তেফাক বা মোছলেম বন্ধুত্ব সূত্র (১৯২৬)।

১৭. আবদুল আজিজ, মীর, এসলাম রত্ন (১৯৩০)।

১৮. আবদুল ওয়াহেদ, আলহজ্ব মৌলভী, মোসলেম প্রতিভা দ্বিতীয় খন্ড, (১৯২৬)।

১৯. আবদুল করিম, মুহম্মদ (জি. টি. এস.), আলেম সাগর (১৯২৯)।

২০. আবদুল খালেক, মুহম্মদ, কলিকাতার হাঙ্গামা (১৯২৬)।

২১. আবদুল গনি, মুহম্মদ, সমাজ দর্পণ (১৯২৪)।

২২. আবদুল গনি, মুহম্মদ, ভাই মুসলমান (১৯২৪)।

২৩. আবদুল মজিদ খোন্দকার, মোসলেম সমাজতত্ত্ব (১৯৩০)।

২৪. আবদুল হাই, বি. এ. এস, দুটো কথা (১৯২১)।

২৫. আবদুল হাফিজ সরিফাবাদী, প্যান-ইসলাম (১৯২৩)।

২৬. আবদুল হামিদ, শাহ, শাসন-সংস্কারে গ্রাম্য মোছলমান (১৯২১), কৃষক-বিলাপ (১৯২২)।

২৭. আবদুস সফি মোল্লা, মুহম্মদ, পোনাবালিয়া হত্যালীলা (১৩৩৪); মুক্তিপথ প্রথম ভাগ (১৯২৭)।

২৮. আবদুল ওদুদ, কাজী, নবপর্যায়, প্রথম খন্ড (১৩৩৩); নবপর্যায়, দ্বিতীয় খন্ড (১৩৩৬)।

২৯. আবদুস সালাম, পর্দ্দাতত্ত্ব (১৯২৪)।

৩০. আবুবকর সিদ্দিকী, খেলাফত আন্দোলন পদ্ধতি (১৯২১)।

৩১. আবুল হুসেন, বাংলার বল্‌শী (১৯২৫); বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা (১৯২৮); মুসলিম কাল্‌চার (১৯২৯)।

৩২. আমিন উল্লা, এ. কে, বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাদিগের প্রতি তোহ্‌ফা (১৯২৬)।

৩৩. আহ্‌ছানউল্লা, খানবাহাদুর, ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (১৯২৬)।

৩৪. ইদরিস আহমদ, ইসলাম রত্ন (১৯২১)।

৩৫. ইয়াকুব আলী, বি. এ, মুহম্মদ, মুসলমানের জাতিভেদ (১৯২৭)।

৩৬. ইয়াকুব আলী, মুহম্মদ, জাতের বড়াই (১৯২৭)।

৩৭. ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, নারীর উক্তি (১৯২০)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. ইয়াসিনুদ্দীন, খেলাফত আন্দোলন পদ্ধতি (১৯২২)।

৩৯. উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, প্রেমশক্তি ও জননী (১৯২২)।

৪০. এমদাদ আলী, মুহম্মদ, মিলন যুগ বা নীতি রহস্য (১৯২১); তরিকোল ইসলাম বা মোসলেম নীতি, পঞ্চম খন্ড (১৯২২); কুরীতি বর্জন (১৯২৩); তরিকোল ইসলাম, ষষ্ঠ খন্ড (১৯২৩); হক কথা (১৯২৮)।

৪১. এম. সফি, স্বরাজ পথে হিন্দু-মুসলমান (১৯২১)।

৪২. এয়াকুব আলী চৌধুরী, মানব-মুকুট (১৯২২)।

৪৩. ওয়াজেদ আলি, এস. মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য (১৩৩২); বাঙ্গলী মুসলমান [অভিভাষণ] (১৯৩০)।

৪৪. কেদারনাথ মজুমদার, রামায়নের সমাজ (১৩২৭)।

৪৫. কেরামত আলী, মুহম্মদ, ভারতে একতা স্থাপন (১৯২১)।

৪৬. খগেন্দ্র নাথ মিত্র, মুদ্রা-দোষ (১৯২২)।

৪৭. খলিলুর রহমান, মুহম্মদ, এক সত্যে হিন্দু-মুসলমান (১৯২০)।

৪৮. খলিলোর রহমান, বর্তমানে মুক্তির পথ কি ? (১৯২৭)।

৪৯. খলিলোর রহমান কাদেরী, শাহ, ধর্মতত্ত্ব (১৯২৮)।

৫০. গোলাম আকবর আলী বেগ ও অক্ষয়চন্দ্র ভদ্র, খেলাফৎ ও মোস্লেম জগৎ (১৯২২)।

৫১. চারুচন্দ্র রায়, কমলাকান্তের পত্র (১৩৩০)।

৫২. চিত্তরঞ্জন দাশ, কাব্যের কথা (১৯২০); দেশের কথা (১৯২২)।

৫৩. জগদীশচন্দ্র বসু, অব্যক্ত (১৩২৮)।

৫৪. জগদানন্দ রায়, গাছপালা (১৯২১); মাছ ব্যাঙ সাপ (১৯২৩); বাংলার পাখি (১৯২৪)।

৫৫. জমির উদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, কাব্যনিধি, শেখ মুহম্মদ, রদ্দে সত্য-ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃস্টান (১৯২৬)।

৫৬. জাহেদল হক চৌধুরী, প্রাণের সাথী (১৯২৫)।

৫৭. দিলীপকুমার রায়, মনের পরশ (১৯২৬); বহুবল্লভ (১৯২৭); দু'ধারা (১৯২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা (১৯২০); প্রবন্ধ-মালা (১৩২৭); চিন্তামনি (১৯২২)।

৫৯. দেরাজুদ্দীন, হাজী মুহম্মদ, সমাজ-দর্পণ (১৯২৫)।

৬০. দেবজ্যোতি বর্মণ, কার্ল মার্কস (১৯৩০)।

৬১. নজরুল ইসলাম, কাজী, যুগবাণী (১৯২২); রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩); দুর্দিনের যাত্রী (আনুমানিক ১৯২৬); রুদ্রমঙ্গল (১৯২৬)।

৬২. নফিজর রহমান, মুহম্মদ, দ্বিতীয় কারবালা (১৩৩৪)।

৬৩. নলিনীকিশোর গুহ, পথ ও পাথেয় (১৩৩৫)।

৬৪. নলিনীকান্ত গুপ্ত, সাহিত্যিকা (১৯২০); রূপ ও রস (১৯২৮); শিক্ষা ও দীক্ষা (১৯২৮)।

৬৫. নূর আহমদ, আবু যযোহা, তরুণ আলো (১৯২৬)।

৬৬. নূরুজ্জামান, এম. ডি, মহিলা শিক্ষা (১৯২৭)।

৬৭. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রুশ জাতির কর্মবীর (১৯২৪)।

৬৮. প্রমথ চৌধুরী, আমাদের শিক্ষা (১৯২০); দু-ইয়ারকি (১৯২১); বীরবলের টিপ্পনী (১৯২১); রায়তের কথা (১৯২৬)।

৬৯. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অন্ন সমস্যা (১৯২০); জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা (১৯২০); অধ্যয়ন ও সাধনা (১৯২১); জাতি গঠনে বাধা ভিতরের ও বাহিরের (১৯২১); বস্ত্র সমস্যা (১৯২২); মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রয় (১৯২৫)।

৭০. প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯২৫)।

৭১. প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি, লেনিন ও সোভিয়েট (১৯২২)।

৭২. প্রিয়কুমার গোস্বামী, স্বাধীনতার স্বরাজ (১৯২৩)।

৭৩. ফণিভূষণ ঘোষ, লেনিন (১৯২১)।

৭৪. ফজলুর রহমান রণ ভাওয়ালী, ভাওয়াল প্রজার প্রাণের কথা (১৯৩০)।

৭৫. বরকতুল্লাহ্, মোহম্মদ, পারস্য-প্রতিভা, প্রথম খন্ড (১৩৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

৭৬. বলাই দেবশর্ম্মা, বৈশাখী-বাঙলা (১৯৩০)।

৭৭. বনমালি ভট্টাচার্য্য, মুক্তি-পথ (১৩২৭)।

৭৮. বামনদাস মুখোপাধ্যায়, মাতৃচর্য্যা (১৩৩৩)।

৭৯. বিপিন চন্দ্র পাল, আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ (১৯২২)।

৮০. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাল-পার্ব্বণ (১৩৩১)।

৮১. মঈনুদ্দীন হুসায়ন, খেলাফত প্রসঙ্গ (১৯২১)।

৮২. মফিজুদ্দীন আহমদ, বি. এল, পথের সন্ধান (১৯২৬)।

৮৩. মসিহুর রহমান কোরেশী, হাকিম, ইসলাম ও ইউরাপ (১৯২৮)।

৮৪. মন্মথ রায়, মুক্তির ডাক (১৯২৪)।

৮৫. মুহম্মদ আলী, সাহিত্য সংরক্ষণ (১৯২৭)।

৮৬. মুহম্মদ বদিয়জ্জমান, খোন্দকার, বঙ্গের জমিদার (১৯২৫)।

৮৭. মোহিতলাল মজুমদার,মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৯)।

৮৮. যতীন্দ্রমোহন সিংহ, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা (১৩২৮)।

৮৯. যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ (১৯২২)।

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন (১৩৩২); যাত্রী (১৩৩৬)।

৯১. রহম আলী, সৈয়দ, শহিদে কুলকাঠী [পোনাবালিয়া] (১৯২৭)।

৯২. রহমত উল্লা, মুহম্মদ, মোসলেম মিলন (১৯২৭)।

৯৩. রহিমুদ্দীন, এম. কে, মায়ের ডাক (১৯২৪)।

৯৪. রায় বাহাদুর বিহারী মিত্র, ভাবুক ও সভ্যতা রহস্য (১৯২৬)।

৯৫. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিচিত্র-জগৎ (১৯২০); যজ্ঞ-কথা (১৩২৭); নানা-কথা (১৯২৪); জগৎ-কথা (১৯২৬)।

৯৬. রুহুল আমিন, মুহম্মদ, ইসলাম ও বিজ্ঞান (১৯৩০)।

৯৭. রেবতী বর্মণ, তরুণ রুশ (১৯২১)।

৯৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম, মতিচূর দ্বিতীয় খন্ড (১৯২১); অবরোধ বাসিনী (১৯২৮)।

৯৯. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমের কথা (১৯২০); সখী (১৯২১); সাহারা (১৯২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

১০০. লুত্‌ফর রহমান, ডাক্তার, মোহাম্মদ, মহৎ-জীবন (১৩৩৩); মানব জীবন (১৩৩৪)।

১০১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারীর মূল্য (১৯২৩); তরুণের বিদ্রোহ (১৯২৯)।

১০২. শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন (১৯২২); বাণী মন্দির (১৯২৮)।

১০৩. শামসর রহমান অল-জালানী, উচ্ছ্বাস (১৯২৮)।

ও

সৈয়দ আবুল খায়ের, মুহম্মদ

১০৪. শিশ মুহম্মদ, শেখ, সমাজচিত্র (১৯৩০)।

১০৫. শৈলেশনাথ বিশী, বোলশেভিকবাদ (১৩৩১)।

১০৬. সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, ভারতের সাম্যবাদ (১৯৩০)।

১০৭. সরোজ আচার্য, নব্যরুশিয়া (১৯২৫)।

১০৮. সফিউদ্দীন আহমদ, তওহিদ বা একত্ববাদ, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড (১৯২১); পাপের ফল (১৯২২)।

১০৯. সফি. এম, স্বরাজ পথে হিন্দু মুসলমান (১৯২১)।

১১০. সরফুল ইসলাম, সৌন্দর্য (১৯২৮)।

১১১. সুলতান আহমদ, বি. এল, বি. সি. এস, মুক্তির সন্ধান (১৯৩০)।

১১২. সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, সবুজ কথা (১৯২১); উড়োচিঠি (১৯২২)।

১১৩. সুশীলকুমার গুপ্ত, চিঠি (১৩৩৫)।

১১৪. সৈদুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, ডঃ, রাজমুকুট (১৯২৬)।

১১৫. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্ত পরিচয় (১৩৩১); কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর (১৩৩২); অবতার-তত্ত্ব (১৩৩৫)।

১১৬. হেমন্তকুমার সরকার, স্বরাজ কোন পথে (১৯২২)।

১১৭. হেমন্তকুমার সরকার, স্বাধীনতার সপ্তসূর্য (১৯২৩)।

ও

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।